KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৬২/৭ই আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher অমর নাথ চক্রবর্তী
Title মন্দির	Size 7"x9" 17·78x 22·86 c.m.
Vol. & Number ৫/৫ ৫/৬	Year of Publication : আশ্বিন, ১৩৪০ পৌষ, ১৩৪০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অমরনাথ চক্রবর্তী	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

মন্দিরা

৬ষ্ঠ বর্ষ　　আশ্বিন—১৩৫০　　৬ষ্ঠ সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শেষ লগ্ন

অমিয় চক্রবর্তী

শেষ ইচ্ছায় রঞ্জিত তা'র একটি কথা
প্রাণের পল্‌তে জ্বলেছিল তাতে
অন্তিম প্রাতে,
ছল ছল ছায়া ছুঁয়েছিল স্তব্ধতা।
　জানালার শাসি ভোরের আভায় গোলাপ।
পরমুহূর্তে বাহির রইল প'ড়ে,
শূন্য লুটায় ঘরে।
　　সেই অতটুকু চাওয়া
　　　মৃদুধ্বনি—দাও হাওয়া—
　ধরে রাখি বুকে হারানো প্রাণের তাপ ॥

———

সাংবাদিকতার মোহ

শ্রীনীলিমা দেবী

আজকাল শিক্ষিত লোকমাত্রই রোজ সংবাদপত্র পড়েন, কিন্তু সাংবাদিকের কাজ সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল আছে কিনা তা জানি না। আমার নিজের অবশ্য ছোটবেলা থেকেই সাংবাদিকের কাজ সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল জন্মেছিল। তার কারণও অবশ্য ছিল। ছোটবেলায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি সহরে যেখানে আমাদের বাড়ী ছিল, তার কাছেই ছিল বড় একটি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রের আফিস ও প্রেস। গ্রীষ্মকালে ঐ অঞ্চলে সবাই বাড়ীর বাইরে খোলা আকাশের নিচে খাট পেতে শোয়, আমরাও শুতাম। রাত্রে খাটে শুয়ে শুনতাম প্রেসে ঐ সংবাদপত্র ছাপার শব্দ। গভীর রাত্রে যখনই ঘুম ভেঙ্গে যেতো শুনতে পেতাম ছম্ ছম্ শব্দে প্রেস চলছে। কাজেই সিনেমার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের মতো গ্রীষ্মের রাতে ঐ প্রেস চলার শব্দই ছিল আমার নিদ্রা-জাগরণের আবহ সঙ্গীত।

এখনও মনে পড়ে সেই ছোটবেলায় কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে কল্পনায় গড়ে তুলতাম ঐ সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের আশ্চর্য্য চাঞ্চল্যে-ভরা জীবনের চিত্র, কতদিন মনে মনে ভেবেছি—আমরা ত' অলস অনড়ভাবে ঘুমিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিচ্ছি—আর ওরা—ওরা ত' সারা রাত জেগে সমস্ত পৃথিবীর কত বিচিত্র খবর জানতে পারবে সবার আগে। সমস্ত দুনিয়ার যত কিছু আশ্চর্য্য ও চমকপ্রদ ঘটনার খবর ত' ওদের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ। হয়তো এই রাত্রের মধ্যে ওরা খবর পাবে কোথাও বিরাট এক ভূমিকম্পে এক রাজ্য তলিয়ে গেছে; কিম্বা, হয়তো এক অতি আশ্চর্য্য আবিষ্কারের খবর জানবে, যা কাল সকালে পড়ে আমরা অবাক হয়ে যাবো। রাজ্যের উত্থান-পতন, জীবন-মরণ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, দৈব-দুর্বিপাকের কত খবর; কিম্বা হয়তো মাথার ওপরের ঐ নক্ষত্রলোক থেকে কোনো জীব নেমে এসেছে এ পৃথিবীতে—কি-ই না ওরা জানতে পারে এই রাত্রের মধ্যে। এই সব যেকোনো একটা অপূর্ব্ব ঘটনার খবর জানার প্রথম অতি রোমঞ্চকর মুহূর্ত্ত ত' সাংবাদিকেরাই প্রথম উপভোগ করবে। আমার কল্পনায় সাংবাদিক হয়ে উঠতো ঈশ্বরতুল্য এক সর্ব্বজ্ঞ ও পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আর আকাঙ্ক্ষা হ'তো অদৃশ্যরূপ ধরে ঐ সংবাদপত্র আফিসে গিয়ে সাংবাদিকের পেছনে বসে তার সেই চাঞ্চল্য আর উদ্দীপনায় ভরা জীবনের অন্তত একটুখানি স্বাদ নিয়ে আসি। কিন্তু, হায় রে, অদৃশ্যতার বর শুধু গল্পের বইতে লোকে পায়, কাজেই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে কোনো দেবতা, কোনো পরী আকাশ থেকে নেমে এসে আমাকে অদৃশ্যতার বর দিয়ে গেল না।

তবে যদি সত্যিই অদৃশ্যতার বর নিয়ে ঐ সংবাদপত্রের আফিসে গিয়ে পৌঁছুতে পারতাম, তাহ'লে সেই বয়সেই সাংবাদিকতার মোহ বোধহয় অনেকখানি কেটে যেতো। কারণ, গিয়ে দেখতাম আমার কল্পিত সাংবাদিকের জীবন আর তার বাস্তব রূপের মধ্যে তফাৎ আছে অনেকখানি। দেখতাম যে সংবাদপত্রের আফিস্ সমস্ত রাত ধরে চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনায় জমজমাট হয়ে থাকে না। সম্পাদকীয় বিভাগের লোক দিনের কাজ শেষ করে ঘরে গিয়ে আমারই মতো ঘুমিয়ে হয়তো রাত কাটাচ্ছে। শুধু ছাপাখানায় রাত্রের শিফ্‌টের লোক ভোরবেলার সংখ্যা ছাপতে ব্যস্ত আর নৈশ সম্পাদক ঐ সংখ্যা বার করার দায়িত্ব নিয়ে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় পাহারা দিচ্ছেন। রাত্রের মধ্যে অভাবনীয়ক অতি আশ্চর্য্য কোন ঘটনার খবর এলে তাঁর মনে উৎসাহ বা উদ্দীপনার বদলে জেগে উঠে বোধহয় উৎকণ্ঠা ও বিরক্তিই বেশী। কারণ, যে পৃষ্ঠায় বিশেষ সংবাদগুলি সাজানো হয়েছে, তখন তাঁকে সেগুলি হয়তো ওলট-পালট করতে হবে, আবার ঠিক সময়মতো কাগজখানাও বার করতে হবে। দৈনিক কাগজের আফিসে সাংবাদিককে কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ চালাতে হয়—মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগরিত, বিচলিত হওয়ার বা চিন্তা করার মতো সময় তাদের

আছে কি? সমস্ত দিন একটির পর একটি ডাক-সংখ্যা ডাকের সময়মত বার করা, আর অন্য কাগজে ছাপার আগে যতগুলি সম্ভব সংবাদ তাতে ছাপাবার প্রচেষ্টায় তাড়াহুড়ার আর শেষ কোথায়?

সাংবাদিকতার সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা "লিটারেচার ইন্ এ হার্রি" অর্থাৎ ওটা "তাড়াহুড়ার সাহিত্য"। তবে অবশ্য সাংবাদিকতার অনেকগুলি স্তর ও বিভাগ আছে। যেমন ধরুন, একদল সাংবাদিক আছেন যাঁরা বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্র বা নিউস্ এজেন্সির জন্য সংবাদ সংগ্রহ করেন। যাঁরা খবরের খোঁজে দেশ দেশান্তরে ঘোরেন সেসব সাংবাদিকের জীবনে বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার অভাব অবশ্য হয় না। আবার একদল সাংবাদিক আছেন যাঁদের কাজ সংবাদপত্রে ঐ সংবাদগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করা—অর্থাৎ যাঁরা কাগজের সব-এডিটার ও নিউজ-এডিটার। তাঁরাই বিচার করেন: কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ সংবাদ যাবে, কোন্ খবরের ওপর কি, কতগুলি ও কি মাপের অক্ষরে হেড্ লাইন্ দেওয়া হবে। সকালবেলা যখন খবরের কাগজ আমরা পড়ি আমরা হয়তো ভেবেই দেখি না যে কতগুলি লোকের কতখানি পরিশ্রমের ফলে ঐ সাজানো গোছানো সংবাদগুলি পড়তে পারি, আর বিশেষ সংবাদ আমাদের চোখে যে আগে পড়ে তা-ও ঐ সাংবাদিকদের খবর সাজাবার কারিকুরির গুণে।

এ ছাড়া আবার একদল সাংবাদিক আছেন—যাঁদের কাজ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে মতামত ও সমালোচনা লেখা। এঁরাই সৃষ্টি করেন "তাড়াহুড়ার সাহিত্য"; যদিও সংবাদ বিভাগের চাইতে এঁদের হয়তো ঘড়ির তাড়না কিছুটা কম ভোগ করতে হয়। তবে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো ধীরে সুস্থে প্রবন্ধ লেখবার সুযোগ এঁদেরও নেই।

স্বাধীন দেশে অবশ্য সাংবাদিক জীবনের জৌলস ও ক্ষমতা আমাদের দেশের চাইতে অনেক বেশী। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও সাংবাদিকের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বড় কম নয়। সাংবাদিকের খবর সংগ্রহের তৎপরতায় আন্তর্জাতিক কূটনীতির চক্রান্ত ফাঁশ হয়ে যায়, আর অনেক সময় সেই সংবাদ প্রকাশের ফলে রাজ্য-উজিরের উত্থান-পতন ঘটতে দেখা গিয়াছে। আন্তর্জাতিক খবর সংগ্রহকারী বহু সাংবাদিক আজ জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন মহিলা সাংবাদিকও আছেন; তিনি ফরাসী, নাম তাঁর মাদাম তাবুই (Tabouis)। এ যুদ্ধ সুরু হওয়ার বহু পূর্ব্বে তিনি ইউরোপীয় কূটনীতির বহু চক্রান্তের সংবাদ প্রকাশ করে ফরাসী দেশকে আগতপ্রায় বিরাট সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেইসব কারণেই আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন।

আমাদের দেশে মহিলা-সাংবাদিক নেই বললেই চলে। অবশ্য কিছুকাল থেকে অল্পসংখ্যক মেয়ে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতে, আর দু'চারটি মাসিক-পত্রের সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু সংবাদ-সংগ্রহ বা দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে সাংবাদিকের জীবনের আসল রূপ কি তা ঠিক বোঝা যায় না। পাশ্চাত্যে অবশ্য অনেক মেয়েই সংবাদ সরবরাহ ও দৈনিক সংবাদপত্রের বিভিন্ন কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছেন; এ ছাড়া বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিকপত্রে যা মেয়েদের পড়বার জন্যই বিশেষ করেই প্রকাশিত হয় সেগুলিরও সম্পাদনা মেয়েরাই করেন। কাজেই পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইংল্যণ্ড ও আমেরিকায়, আজ সাংবাদিক মহলে মেয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। আমাদের দেশেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্র ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আমাদের দেশের মেয়েদের এখনও সাংবাদিকতার মোহ পেয়ে বসেনি, কিন্তু সংবাদপত্র-প্রেসের কালির গন্ধ একবার নাকে গেলে সাংবাদিকতার মোহ আর কাটিয়ে ওঠা যায় না। সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা যেশী না থাকলেও আশৈশব তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। দেশে বিদেশে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে যে সহরে যখনই গেছি, ঐ সাংবাদিক মহলেই ভিড়ে গেছি। সাংবাদিক জীবনে আর কিছু না হোক—বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়, মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি বাড়িয়ে দেয় আর তার সমস্ত চেতনা ও অনুভূতিগুলি তীক্ষ্ণ ও সজাগ করে তোলে। কাজেই প্রায়ই দেখা যায় যে সাংবাদিক মাত্রেই আলাপে আলোচনায় অন্য লোকের চেয়ে

অনেক বেশী পটু, তার কথাবার্ত্তা অনেক কৌতূহলের খোরাক জোগায়—কখন একঘেয়ে বা নীরস লাগে না। তা সত্বে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে সাংবাদিকতার মোহটা এড়িয়েই চলাই ভালো। সাংবাদিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে তাদের পংক্তিতে উঠে নিজেকে খুব গৌরবান্বিত বোধ করতাম—হঠাৎ একদিন একজন সাংবাদিক বললেন—"নতুন সেন্‌সাস্ রিপোর্ট দেখেছ?" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?" তিনি বল্লেন "সেন্‌সাস রিপোর্টে আমাদের স্থান কোথায় জান? বেদে ঠক্ ভবঘুরে—এদের সঙ্গে!" কাজেই বলছি বেদে, ভবঘুরে প্রভৃতির সঙ্গে পংক্তিভূত হ'তে না চাইলে—সাংবাদিকতার মোহটা পারতপক্ষে এড়িয়েই চলাই উচিত!

ভীরু

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির

জীবনের দিন কেটে যায়
তবু স্বপ্ন নাহি ভাঙে,
উন্মুখ প্রত্যাশা ভরে
উদ্গ্রীব বসিয়া থাকি।
নাহি জানি
রুদ্ধশ্বাস এ প্রতীক্ষা কিসের লাগিয়া।
তবু বসে থাকি
তবু চিত্ত ওঠে দুলে
না জানিয়া না বুঝিয়া আশা আশঙ্কায়।

মাঝে মাঝে অকস্মাৎ ক্ষণিকের লাগি
মনে হয় পাইয়াছি,
এত দিনে খোঁজা হল শেষ।
মনে হয় আপনারে ভুলি
মুহূর্ত্তে ছড়ায়ে দিই ভুবন ভরিয়া
জীবনের সকল সঞ্চয়।
কৃপনের মত দিনে দিনে
সন্তর্পণে সতর্ক এ চলা,
প্রতি মুহূর্ত্তের লাগি দুঃসহ ভাবনা—
তার ভার
চির তরে দিই নামাইয়া।
কিন্তু চিত্তে নাহি বল
সাহস নাহিক মনে।

জোর করে সব ভয় ভাঙি,
তুচ্ছ করি হিসাব নিকাশ,
নিঃশেষে ঢালিয়া দিই
আপনারে জনমের মত।

সন্দেহ সংশয়ে
চিত্ত ভরি লক্ষ লক্ষ নতুন ভাবনা
সর্পশিশুসম জাগে।
করি আগুপিছু,
গণি ক্ষতিলাভ
অকস্মাৎ চোখে পড়ে
মিথ্যা এ প্রয়াস।
দেবার মতন কিছু নাহিক জীবনে।
মুহূর্ত্ত যে স্বপ্ন দেখেছিনু
মুহূর্ত্ত যে ভেবেছিনু
ধরণীতে দিব ঢালি দান,
মুহূর্ত্তের মরীচিকা মুহূর্ত্তের শেষে
কোথায় মিলালো?
তখন অন্তর ভরি শূন্যতা কেবল,
কেবল বসিয়া থাকা
কেবল আকুল হয়ে দীর্ঘ রাত্রি দিন
প্রতীক্ষার পল গোনা।

মেরী শেলি

শ্রীপ্রতিভা বসু

পার্সি বিশ শেলি — কবি
গডউইন — দার্শনিক
স্তার টিমথী শেলি — শেলির বাবা
উইলিয়াম্‌স্ — ঐ বন্ধু
ট্রেলনি — ঐ বন্ধু ও নাবিক
অধ্যাপক — শেলির বন্ধু
ফ্যানি, জেন, মেরী — গডউইনের মেয়ে
জেন — উইলিয়ামের স্ত্রী
এ্যামিলিয়া — শেলির প্রণয়িণী

—০—

প্রথম দৃশ্য

বসবার ঘরে

গডউইন ও তার তিন কন্যা

গডউইন—মেরী, আজ শেলি আসবে, হয়তো এক্ষুনি সে এসে পড়বে। এর আগে জেন্ ও ফ্যানির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তুমি তখন স্কট্‌ল্যাণ্ডে ছিলে।

মেরী—বাবা, সেই অসাধারণ মানুষটিকে দেখবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। আমার কল্পনায় উনি একজন পুরাকালের গ্রীক্-দেবতা হয়ে আছেন।

গডউইন—এক্ষুনি সেই দেবতাকে চাক্ষুষ করবে ভয় নেই। আমি একটু আস্‌ছি। (প্রস্থান)

জেন—মেরী, শেলি যেন আসেনা—তাঁর যেন আবির্ভাব হয়। তাঁর মুখের দিকে তাকালে চোখ ফেরেনা। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলে শ্রবণের আকাঙ্খা আরো বেড়ে যায়।

ফ্যানি—মেরী, জেন যা বলছে তা আমারো কথা। তুমি ছিলেনা, মনে মনে ভাবছিলুম তাঁর কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা যদি কারো থাকে সে একমাত্র তুমি।

মেরী—ফ্যানি, ও রকম বোলোনা—ওসব ঠাট্টা কোরেও বলতে নেই। আমাকে অপ্রস্তুত কোরোনা।

(গডউইনের প্রবেশ)

গড—এই যে, শেলি এসেছেন!

মেরী—(বিহ্বল কণ্ঠে) শেলি এসেছেন!

(শেলির প্রবেশ)

গডউইন—শেলি, এই আমার বড় মেয়ে মেরী।

শেলি—(বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ) মেরী?

ফ্যানি—(ঠাট্টার সুরে) কি মিঃ শেলি, আপনার স্বপ্নের সঙ্গে মিলছেতো?

জেন—কবির স্বপ্ন যে সুষমায় ভরা সে সুষমা কি বাস্তবে সম্ভব হয় ফ্যানি?

শেলি—আপনারা ভুল করছেন, আমার স্বপ্ন আজ হার মেনেছে বাস্তবের কাছে, আমি বুঝেছি আমার স্বপ্নের অতীতও অনেক আছে এ বিশ্ব-সংসারে।

মেরী—(লজ্জিত কণ্ঠে) কী যে বলছেন। আপনি কবি, আপনার ভাষা তাই নির্ঝরের মত প্রবাহিত হয়। কিন্তু আমার মনের ভাবকে আমি যদি কখনো রূপ দিতে পারতাম তা হ'লে বোঝাতে পারতাম আপনি কি, আপনার আবির্ভাব আমার পক্ষে কতখানি।

গড—শেলি, তুমি এদের সঙ্গে কথা বল, আমি আসছি। (প্রস্থান)

শেলি—আপনাকে কি বলে সম্বোধন করবো জানিনা। আমার আত্মা যা চায় তার যদি আমি অসম্মান না করি তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে আপনার নাম নিয়ে আমার কণ্ঠ গান গেয়ে উঠবে।

মেরী—আপনার মুখে আমার নাম উচ্চারিত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

জেন—ফ্যানি, চল আমরা কবির জন্য নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসি।

মেরী—বোন, তোমরা বোসো, আমাকেই সেই সৌভাগ্যের অধিকারী কর আজকে।

ফ্যানি—না মেরী, তুমি বোসে কবির সঙ্গে গল্প কর, আমরাই যাই। (প্রস্থান)

শেলি—মেরী, তুমি য়েয়োনা, তুমি বোসো—আমার মানসলোকে যে সৃষ্টির বীজ এখনো ফোটেনি—তোমার অনিন্দ্য মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে সে যেন আজ নিমেষে ফুটে উঠ্‌লো, তোমার অপরূপ স্পর্শে আমার চেতনার এক নতুন দ্বার আজ খুলে গেল। মেরী—

মেরী—কবি, এ কি ভাগ্য আমার! এ আপনি আমায় কোন স্বর্গলোকের দরজায় নিয়ে এলেন? এই সৌভাগ্যের তার আমি বইবো কেমন কোরে?

শেলি—মেরী, 'সে ছিল আমার স্বপন-চারিণী', সে ছিল আমার অন্তরের 'অন্তর-বাসিনী', আজ তাকে আমি দেখেছি তোমার চোখের আলোয়!

মেরী—শেলি, আমাকে তুমি তাসিয়ে নিলে—তোমার প্রেমের স্রোতে বৃন্ত-খসা ফুলের মত আজ আমি ভেসে গেলাম। আমাকে তুমি শক্তি দাও, রক্ষা করো।

শেলি—(বিহ্বল কণ্ঠে) মেরী, মেরী—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গডউইনের বাড়ি

গডউইন ও শেলি

গডউইন—শেলি, আমি আশা করি এবার তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাবে। তুমি সাসেক্‌সের ধনী ব্যারনেট—স্যার বিশ শেলির পৌত্র এবং পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ টিমথী শেলির পুত্র পার্সি বিশ্‌শেলী।

শেলি—আপনিতো জানেন মিঃ গডউইন, আমাদের পিতাপুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে মতান্তরের তীব্রতা কত প্রখর।

গডউইন—দেখ শেলি সংসারটা বড়ই জটিল। কল্পনার আকাশে উড়ে উড়ে চলা জীবনে সম্ভব হয় না।

শেলি—মিঃ গডউইন, এই কি আপনার আদর্শবাদ? আপনার কাছ থেকেই কি আমরা এই মন্ত্র পাইনি যে বাস্তব পৃথিবী অসত্য আর মিথ্যায় ভরা, সমাজ মানুষকে শত নিয়মের নাগপাশে কেবল পঙ্গু কোরে রাখে, সুন্দরের—

গড—থাক্ থাক্ ওসব আমি শুনতে চাইনে। সংসারে যার অর্থের মোহ এত কম সে মানুষ মূর্খ! আমি যা বলি শোন—তুমি এখন সাবালক হয়েছ, তুমি ফিরে যাও তোমার পিতার কাছে—আর তা যদি না যাও তা হ'লে তুমি আমার এখানে আর এসো না। আমি চাইনা তোমার মত একজন সমাজ-বিদ্রোহী আমার কন্যাদের সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করে।

শেলি—(ব্যথিত কণ্ঠে) আপনিই কি সেই সমাজ-বিপ্লবের আদর্শ প্রচারক গডউইন? আপনাকেই কি আমি আমার অন্তরের গুরু বলে এক সময়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম?

গড—শেলি—সংসার কবিত্বের জায়গা নয়। তুমি যাও আর এসো না।

(স্খলিত পায়ে শেলি ঘর থেকে দরজায় বাইরে এলো। দরজার আড়ালে মেরীকে দেখে)

শেলি—তুমি! তুমি এখানে? মেরী আমাকে বিদায় দাও! এ সংসারে আরো কত শাস্তি আমার জন্য উদ্যত হয়ে আছে জানিনা। তবু যে তোমাকে আমি দেখলাম সেটাই রইল আমার সান্ত্বনা।

মেরী—(অশুষ্ক কণ্ঠে) পার্সি, দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

শেলি—মেরী, আমার আত্মার সহচরী। যে সত্যকে আজ তুমি উপলব্ধি করতে পারছ, যে সত্য আজ তোমার আর আমার মুক্তির উপলক্ষ্য হয়ে অন্তরের তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে, মনে রেখো সে সত্য থেকে যেন কখনো তোমার স্খলন না হয়। হ্যারিয়েটও একদিন এ ভাবেই আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল কিন্তু আমি তাকে সুখী করতে পারিনি—অর্থই অনর্থ হয়ে আমাদের আত্মার যোগসূত্র দিয়ে দিল।

(দ্রুতপায়ে জেনের প্রবেশ)

জেন—শেলি, আমাকে নাও তোমার সঙ্গে—তোমার অন্তরের আলোয় বিভায় বিভাসিত কর আমাকে, আমি যাব তোমার সঙ্গে—।

শেলি—জেন, আমার দারিদ্র্য ও এরকম যাযাবর জীবনের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িয়ে নিজেকে বিড়ম্বিত কোরোনা। আমার মন আজ বড়ই ভারাক্রান্ত। তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবার সময় নেই কিন্তু তুমি এসোনা এ পথে।

জেন—শেলি, তোমার দেবভোগ্য সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।

মেরী—জেন, ফিরে যাও তুমি—আমার মনে হয় ফিরে যাওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল। বাবার উপর রাগ কোরে নিজের দুঃখ নিজে ডেকে এনোনা। আমি তোমার বড়, আমার কথা শোনো।

জেন—মেরী, শুভ ইচ্ছায় আমাকে বাধা দিওনা। শেলির সত্যকে আমারও সত্য বলে গ্রহণ করতে দাও। আমাকে তোমরা দীক্ষিত করো তোমাদের মন্ত্রে। আমাকে তোমাদের শিষ্যা, তোমাদের সহচরী কোরে ধন্য করো।

শেলি—তবে তাই হোক—মেরী, তুমি আমার দুঃখের মধ্যে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছ, আশা করি জেনের সাহচর্য্য আমাদের যুগল-জীবনকে আরো মধুময় কোরে তুলবে। তোমরা প্রস্তুত থেকো, আমি কাল ভোর চারটার সময় গাড়ি নিয়ে আসবো।

তৃতীয় দৃশ্য

ইংলণ্ডের কোন এক জঘন্য গলী

রাত্রিবেলা মেরী ও শেলি মুখোমুখী বসে আছে

মেরী—পার্সি, তুমি এত ম্লান কেন? কি হয়েছে তোমার?

শেলি—মেরী, তোমাকে বলবো কি, নিজে না খেয়ে আমি যাদের খাবার সংস্থান করেছি, যাদের আমি নিজের নামে ঋণ করে টাকা পাঠিয়েছি আজ তারাই লুকিয়ে আমার পেছনে পাওনাদার লেলিয়ে দিয়েছে, পুলিশে খবর দিয়েছে। সেতো কেবল আমার একার কষ্ট নয়, সে কষ্ট যে তোমাকে ভোগ করতে হয় মেরী।

মেরী—মানুষের অকৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু তুমি আমার কথা ভেবে কেন মন খারাপ করছো পার্সি? আমি কি তোমার সুখভোগের অংশী হোতেই সঙ্গিনী হয়েছি? আমি যে তোমাকে পেয়েছি সে সুখই আমার পরম সুখ। তার চেয়ে বড় আর আমি কিছুই মনে করিনা।

শেলি—মেরী, একথা আমাকে তুমি ছাড়া আর কেউ বলেনি। সকলের কাছেই আমি অধঃপতিত—টাকা নেই, বাড়ি নেই, সমাজ, আত্মীয় বন্ধু কিছু নেই আমার;—একমাত্র তুমি!—তুমিই আমার জীবন রঙে, রসে ভরে রেখেছ। এত কষ্টের মধ্যেও আমাদের মিলিত-জীবনের আনন্দ থেকে তুমি আমাকে একচুল বঞ্চিত করোনি। মেরী, সত্যিই তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী—আমার আত্মার পরমআত্মীয়।

মেরী—পার্সি, তোমাকে আজ একটা কথা জানানো দরকার হয়ে উঠেছে। জেনের কোন ব্যবস্থা করা কি আমাদের উচিত নয়? আমাদের দাম্পত্য-জীবনের ছায়া হয়ে ও আর কতকাল থাকবে? ও আজ কৈশোর অতিক্রান্ত হয়ে যৌবনের সীমায় এসে পৌঁচেছে। আগে ওর পক্ষে যা ছিল শ্রদ্ধা তা আস্তে আস্তে দাঁড়িয়েছে প্রেমের রূপ নিয়ে—যা ছিল নিষ্ঠা তা দাঁড়িয়েছে লোভ হয়ে। আমি বুঝতে পারি তোমার সঙ্গে বোনের কিম্বা গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ থেকে ও চ্যুত হেয়েছে।

শেলি—একি সত্যি! কিন্তু মেরী, যদি তা সত্যিই হয় তবে তো তা অবহেলার যোগ্য নয়—

মেরী—সেজন্যেই বলছি, ওর মনের এই বৃত্তিকে কি আমাদের প্রশ্রয় দেয়া উচিত? ওকে তুমি অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা কর।

শেলি—মেরী, তা কি কোরে সম্ভব? ও যদি আমার প্রতি আসক্ত হয়—আমি ওকে কেমন কোরে দূরে রেখে আসবো!

মেরী—পার্সি, তুমি বলছো কি?—

(হঠাৎ জেন ছুটতে ছুটতে ঘরে এলো)

জেন—(ত্রস্তকণ্ঠে) শেলি, ওঘরে ভূত আছে, আমার বড় ভয় করছে আমি একা থাকতে পারছিনা।

মেরী—জেন, তুমি কি পাগল হলে? ভূত বাইরেনা, ভূত ঢুকেছে তোমার মনে।

শেলি—ছিঃ মেরী, বেচারা ভয় পেয়েছে, নিষ্ঠুর হোয়োনা।

জেন—শেলি, সত্যি আমার বড় ভয় করছে। তুমি আমার ঘরে এসো একবার।

মেরী—পাসি, তোমরা থাক, আমি দেখে আসি। জেন, এরকম ছলনা আর দ্বিতীয়বার কোরোনা। (প্রস্থান)

শেলি—জেন, আমি বুঝেছি তুমি আমাকে ভালবাস। মেরী বিরক্ত হয়েছে সেজন্যেই তোমাকে ওরকম তিরস্কার কোরে গেল। তুমি রাগ কোরোনা,—দুঃখ পেয়োনা আমি জানি যে ভালবাসা ন্যায় অন্যায়ের শাসন মানেনা—ভালবাসার কোন আইন নেই।

জেন—(ক্রন্দনারত কণ্ঠে) শেলি, কেন এমন হ'ল? আমি তোমাকে গুরুজ্ঞানেই এসেছিলাম, মেরী আমার অত্যন্ত প্রিয় বলেই এসেছিলাম—তোমাদের নিঃসঙ্গ যুগল-জীবনকে আনন্দময় করবো বলেই এসেছিলাম, কিন্তু এ আমার কী হল?

শেলি—কেঁদোনা জেন, কেঁদোনা, কাছে এসো (মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) এবার যাও, শান্ত মনে ঘুমোয় গিয়ে।

জেন—শেলি, তোমার এই স্নেহ-ভরা স্পর্শ ই আমার জীবনে সম্বল হয়ে থাক্ –আমার বঞ্চিতভাগ্য নিয়ে আমি আর তোমাকে যন্ত্রণা করবোনা।

(মেরীর প্রবেশ)

মেরী—জেন, আশাকরি শেলির সঙ্গে এই নির্জ্জন সাহায্য তোমাকে খানিকটা নির্ভয় করেছে, তবুও চল আজ আমি তোমার কাছেই শোব।

চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যাবেলা

শেলি ও মেরী

শেলি—মেরী, অর্থের লালসা আমার নেই। বাবার সম্পত্তির অধিকার আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ কোরেছি। কিন্তু একজন আত্মীয় বলে গেলেন আমার ঠাকুর্দ্দার মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর উইল অনুযায়ী বাবার মৃত্যুর পরে আমিই হবো সেই আশি-হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তির অধিকারী তাছাড়া একজন আত্মীয়ের আঠারো হাজার পাউণ্ডের আরেক সম্পত্তির আয় আমি এখন ভোগ করতে পারি। আমি মনে করেছি আঠার হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তিটা আমি বাবাকে বিক্রী করে দেব—আর তার বিনিময়ে একটা বাৎসরিক আয়ের বন্দোবস্ত করে নেব। তুমি কি বল?

মেরী—অর্থের মোহ আমারো নেই পার্সি! তুমি যা ভাল মনে কর তাই কোরবে। কষ্টতো কম হোলোনা। দেনার দায়ে তোমার মত মানুষকেও কারাগারের ভয়ে এতদিন আত্মগোপন কোরে থাকতে হল। এরচেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে?

শেলি—মেরী, একটা কথা—আমার মনে হয় জেন সম্বন্ধে তুমি একটু উতলা হয়েছ।

মেরী—পার্সি, বলতে লজ্জা বোধহয় তবু বলি আমার মন বড় অবুঝ হয়েছে। তোমার আর জেনের ঘনিষ্ঠতা সত্যিই আমাকে বড় আহত করে। রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া এই শরীর,—কিছুতেই রিপু-গুলোকে বশ করতে পারিনা তুমি যখন জেনের সঙ্গে পাশাপাশি বোসে সারারাত হরেস (Harace) বা পেট্রার্ক পড়ে অপরিমিত আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠ তখন আমার মন অশান্ত হয়। যদিও জানি তুমি কখনো লোভের দ্বারা প্রেমকে কুণ্ঠিত করবেনা তবু আমার বড় কষ্ট হয়। আমার চোখ জলে ভরে ওঠে।

শেলি—মেরী, ছোট্ট পাখী আমার—এত ভীরু তোমার মন? আর কোন মেয়েকে যদি আমি ভালইবাসি তাহ'লে তোমার এরকম করা উচিত নয়। ছিঃ মেরী—এটাতো তোমার যোগ্য কথা নয়।

মেরী—পার্সি, তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবেনা—তুমি কবি তোমার মনে দাগ ধরেনা কিন্তু আমার মন থেকে সে কালি ওঠেনা আমাকে ক্ষমা করো।

শেলি—ওঃ, ওঃ, কেঁদোনা। সিনমাউথে গডউইনের এক আত্মীয়া থাকেন আমি জেনকে সেখানেই রেখে আসবো। কিন্তু বন্ধু, আরতো আমি ইংলণ্ডে টিকতে পারছিনে। এখনো

আমাদের বিবাহ গির্জ্জার অনুমোদন পেলো না—কতকাল এখানে এরকম অবহেলা সহ্য কোরে সমাজ পরিত্যক্ত হয়ে থাকবো বলতো? অসহ্য! অসহ্য!

মেরী—চল এদেশ ছেড়ে চলে যাই। এরা তোমাকে চায় না, তোমাকে বোঝে না—এদের মন অনুষ্ঠানের লীলাভূমি, অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন এরা।

শেলি—চল তাই যাই। যেখানে নেই মানুষের ভীড়, নেই ঈর্ষা, অবহেলা, প্রবঞ্চনা, সেই নির্জ্জনে যাই। আমি নাস্তিক—আমি গির্জ্জার অনুশাসন মানিনা—

Custom and Faith, and Power thou spurnest,
From hate and awe thy heart is free,
Ardent and pure as day thou burnest
For dark and cold mortality
A living light, to cheer it long,
The watchfires of the world among.

মেরী, আমার মন এই ব্যবহারিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আমি আলাদা, আমি একা তাই এখানে আমি অবান্তর!

মেরী—পার্সি, বিচলিত হোয়োনা, তোমার শান্তি তুমি গড়ে নেবে, তোমার জগৎ তুমি গড়ে নেবে। তুমিই তো স্রষ্টা—সৃষ্টিতো তোমারি হাতে তোমার মর্য্যাদাতো একমাত্র তুমিই তোমাকে দিতে পার বন্ধু।

পঞ্চম দৃশ্য

সিসামগর

(শেলি, মেরী, উইলিয়ামস্, উইলিয়ামসের স্ত্রী, ইতালীয় অধ্যাপক, ট্রেলনি)

শেলি—এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে এতখানি হৃদ্যতা আমাকে সত্যই ব্যাকুল কোরে তুলেছে। সংসার আমার কাছে মরুময় হয়ে উঠেছিল—তোমাদের সাহায্যে হৃদয়ের মৃকতন্ত্রী আবার বেজে উঠেছে।

উইলিয়াম—বন্ধু, এ বন্ধন আমাদের অক্ষয় হোক।

ট্রেলনি—দেখ শেলি, তোমাকে একটা কথা বলি—আমার কাঁছে তুমি যে নৌবিদ্যা শিখতে চেয়েছ তার আগে তুমি সাঁতারটা শিখে নেবে কিন্তু। তোমার ভারি একটা দোষ আছে, বিপদের সময় আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই। সেদিন সাঁতার শিখবে বলে নামলে, নেমেই একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকলে। আশ্চর্য্য! একটু হাত পা ছুঁড়লে না? একটু চেষ্টা করলে না বাঁচতে? সমুদ্রের সঙ্গে অত আত্মীয়তা ভালনা বন্ধু!

শেলি—বন্ধু, তুমি কি সমুদ্র গর্জ্জনে শুনতে পাওনা পাতালকন্যাদের আহ্বানধ্বনি? সমুদ্রের গভীর নীলে তাকালে কি দেখতে পাওনা তরঙ্গশীর্ষে—অপরূপ নারী মূর্ত্তি! হাতে তার বীণা, কণ্ঠে অমৃতের বাণী?

অধ্যাপক—না কবি, রক্তমাংসের মানুষ আমরা—অশরীরীতে আমাদের আসক্তি নেই বরং ওসব শুনলেও আমাদের ভয় করে।

জেন—মিঃ শেলি, ট্রেলনি আপনাকে নৌ-বিদ্যা শেখালে সমস্ত গ্রীষ্ম আমরা সমুদ্রে থাকবো তখন শুনবো আপনার পাতালকন্যাদের ডাক আর দেখবো তরঙ্গশীর্ষের সেই মানবীকে।

শেলি—মিসেস্ উইলিয়াম, কবে আসবে সেই চির-বাঞ্ছিত গ্রীষ্ম! কবে আমরা তীর ছাড়িয়ে যাব সমুদ্রের বুকে—আপনার হাতে গিটারের বুক ফেটে সুর ঝরবে, তার অপূর্ব্বস্বর আমাকে নিয়ে যাবে কোন দূরে কোন কাব্যের কল্প-লোকে! কবে হবে সেদিন!

মেরী—(কম্পিতকণ্ঠে) পার্সি, তুমি কি এখন বাড়ি যাবে?

শেলি—না, মেরী, দরকার থাকলে তুমি যেতে পার।

উইলিয়াম—মিসেস্ শেলি, আপনাকে বড় ম্লান লাগছে আপনার কি শরীর ভাল নেই?

মেরী—ক্ষমা করুন মিঃ উইলিয়াম। সত্যি আমার শরীর মন দুই-ই আজ বড় অসুস্থ, আমি যাই। [প্রস্থান]

অধ্যাপক—শেলি, তোমাকে একজায়গায় নিয়ে যাব আমি!

শেলি—কোথায় বলুন!

অধ্যাপক—দু'টি পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে একজন ধনীর, কিন্তু বিমাতার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বাপ মেয়ে দু'টিকে কনভেন্টে রেখে দিয়েছেন। কেউ যদি দয়া কোরে বিনা যৌতুকে তাদের বিয়ে করে বিয়ে হবে নইলে চিরজীবন ওখানেই

কাটবে। বলবো কি তোমাকে, বড় মেয়েটির নাম এমিলিয়া তার মত রূপবতী মেয়ে আমি আর দেখিনি।

শেলি—আহাহা, কী নিষ্ঠুর তাদের নিয়তি। নিশ্চয়ই যদি অধ্যাপক মশাই। চলুন এখুনি যাই।

উই—শেলি, আমি আর ট্রেলনি অধ্যাপক মশাইকে নিয়ে এখুনি একটা কাজে বেরুচ্ছি কাজেই আজ আর তোমার যাওয়া হয়না।

শেলি—তবে কাল?

অধ্যা—কালও হবেনা। পরশু কেমন?

শেলি—উত্তম।

ট্রেলনি—তা হ'লে আমরা চলি, নমস্কার মিসেস্ উইলিয়াম।

মিসেস্—নমস্কার! [সকলের প্রস্থান]

শেলি—মিসেস্ উইলিয়াম—

মিসেস্—মিঃ শেলি, আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন। জানেনতো আমার নাম জেন্।

শেলি—জেন্, তুমি কি জান আমার অন্তরের দুর্ব্বলতার কথা? তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমার কাব্যে তুমি কতখানি। উইলিয়ামের মত দরদী বন্ধুর স্পর্শে আমি নতুন জীবন পেয়েছি, আমি জানি তোমার প্রতি আমার এই মুগ্ধতা, এই আসক্তি হ'য়তো তাকে আঘাত দেবে কিন্তু কেউ জানবেনা এইকথা—আমার অন্তরের গোপনলোকেই থাকবে তুমি চিরকাল। জেন্—আমার আত্মার সহোদরী—আমাকে ক্ষমা করো—আমার প্রেমকে এই মাটির পৃথিবীর প্রবৃত্তি দিয়ে ভরা ভেবোনা। আমার মন বড় অস্থির, আমি আজ যাই। [প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মেরী বিষন্নমুখে একা একা পায়চারী করছে।

মেরী—আমি আর পারিনা—আর পারিনা। মনে করেছিলুম ঈর্ষাকে বুঝি জয় করেছি—কৈ তাতো পারিনি। কেন রাতদিন আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে। আমার বোনই আমার জীবনকে বিষময় করে রেখেছে, আমি জানি ওর প্রতি পার্সির সহানুভূতি এখন দস্তরমত আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। আবার এই মিসেস্ উইলিয়াম। আমার প্রতি এই ঔদাস্য—(একটু চুপ কোরে থেকে) কিন্তু এ নিয়েতো আমার নালিশ করা উচিত নয়। ঈশ্বর! ভালবাসার গভীরতায় আমাকে মহৎ করো। সে সাই হোক্ আমার ভালবাসা যেন ক্ষুন্ন না হয়। সে কবি, তার মন অন্য সুরে বাঁধা—সেখানে সকল নারীরই সমান অধিকার—আমি কে! আমার একার মধ্যে কত আছে যা দিয়ে চিরকাল তাকে বেঁধে রাখবো। ছিঃ ছিঃ—মন শান্ত হও, শান্ত হও। তোমার থেকে যেন ওর কোন দুঃখ না আসে।

(কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শেলির প্রবেশ)

'Best and brightest, come away!
Fairer far than this fairday.'

শেলি—(সহসা মেরীকে লক্ষ্য কোরে) এই যে মেরী। মেরী, দেখেছ জেনের চোখ? দেখছ কী গভীর রহস্য-ভরা সেই চোখ? কী সুন্দর! আমার মন ভরে দিল জেন্। (একটু চুপ) একি! তুমি কথা বলছোনা যে! কি হয়েছে তোমার? একি তুমি যে কাঁদছ? মেরী, কি হয়েছে তোমার? বল, বল তোমার কী হয়েছে।

মেরী—(কম্পিতকণ্ঠে) প্রিয়তম, কিছু হয়নি আমার। আমি যে অত্যন্ত সামান্য একজন মানুষ—সেই চেতনাই মাঝে মাঝে আমাকে কাঁদায়। তুমি কবিতা বল, আমি শুনি।

শেলি—(খুসী হয়ে) আমার কাব্যকুঞ্জেও আবার ফুল ফুটেছে, আবার শুনতে পাচ্ছি ভ্রমরের গুণগুনানি—।

Radiant sister of the Day
Awake! Arise! and come away!'

(দরজার অধ্যাপকের করাঘাত)

শেলি দরজা খুলে দিল

অধ্যাপক—নমস্কার মিসেস্ শেলি—ভাল আছেন?

মিসেস্ শেলি—আজ্ঞে! বসুন দয়া কোরে।

অধ্যাপক—আজ ক্ষমা করতে হবে। শেলি তুমি প্রস্তুত আছতো?

শেলি—একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। বসুন আমি এক্ষুনি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

মেরী—(ব্যাকুলকণ্ঠে) তুমিতো এইমাত্র বাড়ি ফিরলে পার্সি—অধ্যাপক মহাশয় একটু সময় দিন।—

শেলি—না মেরী, উইলিয়ামের ওখানে জেন্ দেরী করিয়ে দিল—আর দেরী করা ঠিক হবেনা—তুমি কিছু ভেবোনা আমি জেনের কাছে থেয়ে এসেছি। আমি আসছি। [প্রস্থান]

অধ্যাপক—মিসেস্ শেলি—আমার উপরেই হয়তো আপনি রাগ করছেন।

মেরী—রাগ আমি কার উপর করবো অধ্যাপক মশায়! আমারই অন্যায় হয়েছিল ওকে থাকতে বলা। আপনারা কথা দিয়েছেন যাবেন বলে—

অধ্যাপক—মিসেস্ শেলি, কবিযোগ্য স্ত্রী আপনি—আপনার ভালবাসা আকাশের মত উদার। আপনার মত গুণী স্ত্রীর সাহচর্য্যই শেলিকে মহত্বের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

মেরী—আমাকে লজ্জা দেবেন না।

(শেলির প্রবেশ)

শেলি—ইস্, দেরী হয়ে গেল চলুন!

অধ্যাপক—আচ্ছা চলি তা হ'লে। [প্রস্থান]

মেরী—(নিঃশ্বাস ফেলে) আজকাল একটা সন্দেহধনও করে যায় না পার্সি! আমি আজকাল ফুরিয়ে গিয়েছি ওর কাছে। আমাকে নিয়ে আর ওর কাজ মুহূরিত হতে পারছেনা। হা ঈশ্বর সে কার দোষ? এত দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে ওকে আমি আড়াল কোরে রাখি—সমস্ত কষ্ট মাথায় তুলে নিয়েছি ওকে সুস্থী দেখবার জন্য—ওর কি কোন কৃতজ্ঞতা নেই আমার প্রতি? ছিঃ ছিঃ এ আমি কী বলছি। হে আমার হৃদয়, অশান্ত হয়োনা। হতে দাও, হতে দাও ওকে। যেখান থেকেই ওর প্রেরণা আসুক—সে নাইবা হলাম আমি—সে সৃষ্টিইতো হবে ওর অমরকাব্য? ছিঃ ছিঃ হৃদয় শান্ত হও। শেলি—আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম চিরদিন তুমি তোমার আনন্দে আমার সহায়তা পাবে। সে আনন্দ যোগাতে যদি আমার জীবন শেষও হয়ে যায় তবু আমি যেন তা থেকে একচুল সরে না দাঁড়াই।

সপ্তম দৃশ্য

সকালবেলা শেলি বসে লিখছে, মেরী এসে পেছনে দাঁড়াল—

মেরী—পার্সি—

শেলি—(উদ্‌ভ্রান্তের মত) মেরি, তুমিতো দেখনি তাকে।

কনস্টেন্টের অন্ধকার কোণে যখন সে এসে দাঁড়াল, তখন আমি কী দেখলুম! তার চোখের তারায় আমি কী দেখলুম!

I never thought before my death to see
Youth's vision thus made perfect. Emily,
I love thee—

আমার আত্মা কি চিরকাল ধরে একেই দেখতে চেয়েছিল? এতকাল কোথায় ছিল—

Spouse! Sister! Angel!
Pilot of my fate
Whose course have been so starless!
O too late
Beloved! O too soon adored by me.

(একটু চুপচাপ)

মেরী—পার্সি, কদিন থেকেই বলবো ভাবছি—আর তো আমি পারছিনা—টাকার যে বড় টানা-টানি যাচ্ছে—

শেলি—(আপন মনে) আমার কাব্যলক্ষ্মীকে আমি যেন প্রত্যক্ষ করলুম। ভুলে গেলুম সংসারের সমস্ত কষ্ট—সেখানে কেউ নেই—তুমি নেই, সে যেন স্বর্গরাজ্য। আঃ এমিলি।

মেরী—(ব্যথিত কণ্ঠে) শেলি, তুমি কত নির্মম, কত নিষ্ঠুর, তা তুমি জানোনা।

শেলি—মেরি—এ সব তুমি আজ কী বলছ? তোমাকে আমি দুঃখ দিয়েছি? তোমার চোখ বেয়ে জল পড়ছে? ছিঃ ছিঃ মেরী—তুমি কি আমাকে ভুল বুঝবে? তুমি কি আর সকলের মতই আমাকে বিচার করবে। মেরি—তুমি কি জাননা বিশ্বের সমস্ত নারীই আমার আত্মার সহচরী! তুমিতো জান আমার প্রেম প্রবৃত্তির বশ নয়। মেরী, এ সংসারে সহস্র সঙ্গীর মধ্যেও আমি যেমন একা লক্ষ লক্ষ মেয়ের মধ্যেও তুমি আমার কাছে একমাত্র।

True love in this differs form gold and clay,
That to divide is not to take away,
Love is like understanding, that grows
bright,
Gazing on many truths;.....

মেরী—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) পার্সি, আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু আমিতো জানি আমি আজ কোথায়। আমাকে ছাড়িয়ে

আজ তোমার কাব্য-প্রতিভা অপরূপ রূপে দেখা দিল এমিলিয়ার আবির্ভাবে। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় গ্লানি বড় পরাজয় আর কি থাকতে পারে! তবু বলি তুমি বড় হও, মহৎ হও। এই ইংলণ্ড যেন একদিন তোমার নাম নিয়েই মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে।

শেলি—মেরি, এসো, আমার কাছে এসো, আমার পরম-আত্মীয়—আমার সমস্ত দুঃখের শান্তি—মেরী—আমার মেরি—

অষ্টম দৃশ্য

মেরী ও মিসেস উইলিয়ামস্

মেরী—মিসেস উইলিয়মস্ ওরা যে এখনও এলোনা।

মিসেস্—মেরী—আমি কী বলবো—আমার বুকের মধ্যে যেন স্বতন্ত্র ভয়ের শিখা আজ লেলিহান হয়ে উঠেছে—

মেরী—বোন্, আমাকে বলে দাও কোথায় গেলে আমি তার খবর পাবো। এই ঝড়, এই বৃষ্টি—কী হল ওদের নৌকা?

মিসেস্—মেরি, চল আমরাও বেরিয়ে পড়ি ওদের সন্ধানে—

মেরী—আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু এ ঝড়ে যে কোন নৌকা আমাকে নিলনা।

(ট্রেলনির প্রবেশ)

মেরী—এই যে বন্ধু! ট্রেলনি—কী খবর? কী খবর তুমি নিয়ে এসেছ? ও কি? চোখে যে জল? তবে—তবে কি তুমি তাকে খুঁজে পেলে না।

ট্রেলনি—(ভাঙা গলায়) পেয়েছি!

মেরী—তবে! তবে কেন কথা বলছোনা—এতদিন কোথায় ছিল ওদের নৌকা—ওরা কি সমুদ্রেই—

ট্রেলনি—হাঁ মিসেস্ শেলি, সমুদ্রই তাকে নিয়েছে। সে আর নেই এ জগতে।

মেরী—নেই! (চিৎকার করে) সে নেই! আমার পার্সি, আমার প্রাণ; তুমি আর নেই? (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

ট্রেলনি—আমি উইলিয়ামস্ ও শেলি দু'জনের মৃতদেহই সমুদ্র তীরে রেখে এসেছি—বোন ধৈর্য্য ধর—তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে হবে আমাদের। শেলির দেহের উন্মুক্ত অংশ মাছে খেয়ে ফেলেছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম সফোরিস আর কীট্‌সের কবিতার বই, বইয়ের পাতাটি ওল্টানো হয়তো আবার পড়বে বলে উল্টে রেখেছিল—আর পড়া হয়নি—

মেরী—(পাগলের মত) পেলোনা, পেলোনা—আমি যাই, কোথায় সে—আমি সেখানে যাই—পার্সি, আমার পার্সি (ক্রন্দন)

শেষ।

শরতের শাঁখ

শ্রীনরেন্দ্র বসু

শরতের শাঁখ বাজে, আনমনে শুনি বাজে—সকরুণ শরতের শাঁখ
দুখের শরত সে যে,—বুকের আড়ালে বাঁধে ব্যথাভরা পৃথিবীর ডাক!
মর্মে মরিয়া থাকি, সে ডাকে উথলে আঁখি সরমে হৃদয় ভরে যায়,
সর্ব্বহারার বাণী সকল শেষের সুর গুমরিছে আকাশে ধরায়।
গুমরে কালের শিঙা এধারে ওধারে—দূরে: কেঁপে ওঠে আঁধার আলোক
সময়-শ্মশান ছেয়ে অপলক রয় চেয়ে—কাল-পুরুষের কালো চোখ!
বিলয়-চাহনি তলে প্রলয় অনল জ্বলে,—পুড়ে যায় নীল ইতিহাস:
পৃথিবী সভয় মনে অভয় গ্রহর গোনে—আর ফ্যালে দীরঘ নিশ্বাস॥

দারুণ নিশ্বাস ফ্যালে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে যে,—উর্দ্ধে করিয়া আঁখিপাত
একিগো মরণ মেলা বিসর্জ্জনের পালা দোলায়ে ফোলায়ে দিনরাত?
দিবস রজনী শুধু দহিছে কামনা ধূ—ধূ:—নীলনভো ধোঁয়ায় কাজল;
কুটিল ফণীর ফণা দুলিছে রে উন্মনা,—ঝরিছে রে বিষের বাদল!
বিদ্রূপ হানিছে রে মরণের বিজ্ঞান—জীবনের বিদ্রূপ হানিছে;
বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের বেদনায়— মহাকাল বিদ্রোহ আনিছে।
হানিছে ভয়ঙ্কর মরণ রে শঙ্কর!!—নাচিছে অসম তাতা থৈ রে:—
আকাশ সাগর জাগে, পৃথিবী শরণ মাগে; কোথা সে অভয় বাণী কৈ রে?

কোথা সে অভয় বাণী শান্তির সুরধানি—দারুণ দুঃখ-জ্বালা ভুলাতে?
স্নিগ্ধ পরশ কোথা?—অন্ধ হাঁতাড় খুঁজি,—লুটাই একাকী শুয়ে ধূলাতে।
সহজ স্বপন দোলে সাগরের বুকে দোলে—একটানা লহরীর সুর,
কালান্তরের কাল অহরহ ছুটে চলে—দুরান্তরের বহু দূর!—
মৃত্যুমূর্ণীন্ ধরা পরম প্রয়াস ভরা,—বক্ষে বিপুল এই যাতনা—
জীবনের খেলা ঘরে মরণের লীলাভরে স্বজনের সাধ-ভরা সাধনা!—
ধূলার কণিকা গণি শুনি সে ধূলার ধ্বনি,—সে তো আর মিছে কথা নয়
পৃথিবীর চারিপাশে তাহারি বারতা ভাসে,—আর ভাসে ব্যথার হৃদয়!!

ব্যথায় হৃদয় ভাসে, বেদনার ইতিহাসে সহনশীলার নাহি শেষ
মহান কামনা তার ছেয়েছে আকাশ আর সাগর—শ্মশান-মরু-দেশ!
সে সুর আমার মনে দহিছে পৃথিবী সনে: চলিছে গ্রহের শতপাক;
ব্যথিতা মাটিতে ওই মিনতি নিবিড় হলো—"মরণ,—মরণ ভুলে থাক"!
এ নবজীবন কথা পৃথিবীর আকুলতা কে কারে শুনাবে বলো, হায়—
নিপীড়িতা জনতার হৃদয়ের হাহাকার আজো যে হতাশে গুমরায়!
গুমরে সকল প্রাণ শুনিয়া সে আহ্বান,—শুনাব কাহারে সেই ডাক?
মোহন মরুর চরে মানুষেরা বহু দূরে,—হেথা বাজে শরতের শাঁখ॥

একটি মেয়ের কাহিনী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সলজ্জ কাতরকণ্ঠে মেয়েটি বললে, আমার নাম কমলা। বড় জোর বছর পঁচিশ বয়স, কালোর ওপর চমৎকার সুশ্রী চেহারা—দেখলেই বোঝা যায়, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। নিতান্তই পেটের দায়ে অনেকের মতো আজ পথে বেরুতে বাধ্য হয়েছে। কোলে একটি সাত আট মাসের বাচ্ছা মেয়ে। এখনো চেহারায় তার শিশুসুলভ কমনীয়তা জলজল করছে—স্তন পান করতে করতে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে গেছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া বিছিয়ে তাকে ফুটপাথে শুইয়ে দিলে কমলা। তারপর করুণ দৃষ্টিতে তাকালে আমার দিকে।

বললাম কিছু খেয়েছো আজ ?

ঘাড় নেড়ে জানালো—না। তারপর মেয়েটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে কি বললো বুঝলাম ওর হয়েই কিছু চাইছে।

বললাম, কাছে ত মোটে একটা দু'আনি আছে। যদি সঙ্গে আসো তাহলে একটু দুধ দিতে পারি ওর জন্যে আর হয় ত আমার স্ত্রী একখানা কাপড়ও দিতে পারেন তোমাকে। এই গলিটার বাঁকে ঐ যে লাল বাড়ীটা দেখছো—ওতেই থাকি আমি।

মেয়েটাকে ন্যাকড়া শুদ্ধ গুটিয়ে কোলে তুলে নিলে কমলা। বুঝলাম রাজী হয়েছে সে সঙ্গে যেতে।

গণগণ করছে দুপুরের রোদ—রাস্তার পিচ গলে আগুন হয়ে উঠেছে। আগে আগে ছাতা মাথায় দিয়ে চললাম, পেছে পেছে কমলা। রোদের হল্কায় আর ক্ষুধার জ্বালায় কোলের মেয়েটা ককিয়ে উঠছে থেকে থেকে 'ওয়া' 'ওয়া'। পথে কমলা বললে তার কাহিনী—অতি সংক্ষিপ্ত সে কাহিনী, স্বামী তার অন্যের খেত-খামারে কাজ করতো, নৌকা বাইতো, গাঁয়ের হাটে ফল-পাকুড় বেচতো—একরকম করে দিন চলতো তাতেই। এবার দেশ জুড়ে নামলো আকাল—টাকায় এক সের চাল—ক্ষেতের কাজ উঠে গেল, নৌকো বন্ধ হল, লোকে জন-মজুর ডাকে না—তার ওপর এলো বন্যা—স্বামীও সেই সময়ে অসুখে পড়লো, আর ক'দিন পরেই মারা গেল—তখন আর কি করে সে ? দিনকতক মেগে খেয়ে চালালো নিজের পেটটা—শেষটা বেগতিক দেখে আর পাঁচজনের সঙ্গে সহরে এলো ভাতের খোঁজে।

ঠিক এই কাহিনী, বা অনেকটা এই রকমের কাহিনী আজ শুনছি হাজার হাজার নিরাশ্রয়ের মুখে। নূতনত্ব কিছু নেই। নিঃশব্দে পথে পাড়ি দিতে লাগলাম।

স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে আমার পেছনে মেয়েটিকে দেখেই রেগে উঠলেন। বললেন, আবার এই বেলায় একটা লোক কুড়িয়ে আনলে ? ঘরে কি আছে যে তাই খেতে দোব ?

সবিনয়ে বললাম, দেখনা যদি কিছু করতে পারো। কি সুন্দর ওর মেয়েটা দেখো একবার—ওটাকে অন্ততঃ কিছু দাও, বিকেলের চায়ের দুধটা···

ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত মেয়েটা জেগে উঠে কাঁদতে সুরু করেছে। স্ত্রী দু'একবার ইতস্তত করে হঠাৎ কমলার কোল থেকে ছিনিয়ে তাকে নিজের বুকে তুলে নিলেন। ক্ষুধার্ত্ত দামাল শিশুও মুহূর্ত্তেই তাঁর বুকে তোলপাড় করে খুঁজতে সুরু করলো, কোথায় তার খাদ্যের উৎস। আবার দু'একবার ইতস্তত—তারপরই স্ত্রী অবলীলায় তাকে স্তন দিতে সুরু করে দিলেন। ক্ষুধার্ত্ত, অবোধ, অসহায় মানবশিশু অন্যের মাতৃস্তন্য অপার বিশ্বাসে আত্মসাৎ করতে লাগলো—আর কমলা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তাই।

অনেকক্ষণ একটানা খাওয়ার পর পরিতৃপ্ত শিশু আপনিই ছেড়ে দিলে। তাকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে বীণা বললেন, সুন্দর মেয়েটা—না ?

মেয়েটার মুখে তখন হাসি ফুটেছে। ঘরময় সে হামা দিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে !

আমি বললাম, নাও না ওটাকে। আমাদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশিয়ে······

বাধা দিয়ে বীণা বললেন, কি যে বলো তার ঠিক নেই।

তারপরই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কমলার জন্যে একখানা পাউরুটি, কিছু তরকারি ; আর একটু চিনি এনে দিলেন। কাজে কমলা সেগুলো সযত্নে বেঁধে নিলে তার পুঁটলিতে। আমি বললাম, খা না এখানে বসে।

বললে, না বাবু, একজনরা ফ্যান দিয়েছিল—তাই খেয়েছি, ওবেলা খাবো অখন।

স্ত্রীকে বললাম : একখানা কাপড় যদি দিতে ওকে। তোমারি বয়সী—বে-আব্রু হয়ে বেড়াচ্ছে বেচারা।

দেখি তাঁর কাঁধে একখানা পুরানো শাড়ী রয়েছে—বুঝলাম আমার আগেই তিনি অনুভব করেছেন ও জিনিষটার প্রয়োজনীয়তা। সেটি এবং সেই সঙ্গে একটি টাকা দিয়ে তিনি কমলাকে বিদায় দিলেন। শেষবার মেয়েটার হয়ে আর একটু আবেদন করলাম। গৃহিণী একটিমাত্র কথাতেই সমস্ত অনুনয়ের ওপর যবনিকা টেনে দিলেন, না, না ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় !

* * * *

ভেবেছিলাম, কমলা এরপর প্রতিদিনই আসবে। বলতে কি বড্ড মমতা হয়েছিল মেয়েটার ওপর ! যদিও সামর্থ্য আমার বেশী নয়, তবু ওকে ঝিরূপে বাড়ীতে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে চেষ্টাও করেছিলাম। হয়ত দিতামও—কিন্তু কমলা আর এলো না।

একদিন কমলার কথা তুলে স্ত্রীর কাছে গালাগালিও পেলাম মন্দ নয়। তিনি বললেন, হাজার হাজার লোক আজ নিরন্ন নিরাশ্রয় হয়েছে, ক'জনকে তুমি ঠাঁই দেবে ?

বললাম, সকলকে বাঁচাতে পারবো না বলে একজনকেও বাঁচাবো না, একি যুক্তির কথা হল বীণা ?

বীণা বললেন, না হক, আজকের দিনে দায়ে পড়েই মানুষকে স্বার্থপর হতে হয়েছে। ভাবো ত, চাল আর কাপড় কয়লার জন্যে নিজেদের কি নাকাল হচ্ছে ! ছেলে-মেয়েদের দুধ আর জলখাবারের পরিমাণ কি রকম কমেছে। এর ওপর যদি বাড়ীতে তুমি লোক বাড়াও, তাহলে ঐ কয়টি টাকায় আমি চালাবো কি করে ? ওদের বাঁচাতে গিয়ে, নিজের ছেলে মেয়েদের···

এবার আমারও রাগ হয়ে গেল। বললাম, দেখো বীণা, ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ মাত্র একটা ধাপের—সে ধাপটা হল একটা চাকরি। আজ যদি সেটা ছুটে যায়, তাহলে ওদের মতোই আমাদেরও পথ ছাড়া আশ্রয় নেই। তখন আমাদের মুখের ওপর যদি লোকে ঠিক এম্নি করেই দরজা বন্ধ করে দেয় !

বীণা সাধারণতঃ শান্ত মানুষ তর্ক করার প্রকৃতি তাঁর নয়। একটু হেসে তিনি বললেন, মেয়েটা তরুণী না হলে কি ঠিক এতখানি কাতর হতে ওর জন্যে ?

একথা নীচতাসম্ভূত—তবু পত্নীজাতির কাছে হয়ত অপ্রত্যাশিত নয়। চুপ করে থাকলেই ভালো হত—শুধু বললাম বীণা, আমাকে ত তুমি চেনো না এমন নয় !

বীণাও লজ্জিত হয়েছেন হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে ! তিনি আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, সত্যি কিছু মনে করে বলিনি। সত্যি না !

যাই হক, কমলার কথা মন থেকে মুছে গেলনা আমার। আসতে যেতে ট্রামের মোড়ে দাঁড়ালেই সেই জায়গাটার দিকে তাকাই, যেখানে ফুটপাথের ওপর ফুটফুটে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে কমলাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। কোথায় গেল বেচারী ? এই বিশ-পঁচিশ লক্ষ লোকের সহরে পেটের দায়ে কোন্ অলক্ষ্য গলির অন্ধকারে গিয়ে পড়লো সে ?

সেদিন রবিবার—বিকেলের দিকে যাচ্ছি এক বন্ধুর বাড়ী দেখা করতে। হঠাৎ দেখি, ফুটপাথের একটা নলকূয়ো থেকে বালতি ভরতি করছে কমলা আর মিস্ত্রী গোছের একটা লোক দুই ঠোঁটে একটা জ্বলন্ত বিড়ি চেপে ধরে তার হয়ে হ্যাচাং হ্যাচাং করে হাতলটা নাড়ছে !

সামনে এসে দাঁড়ালাম—দেখি কমলার মাথায় তেল পড়েছে, চুলে অল্প একটু সিঁথে, পরণের কাপড়খানাও তার মোটের ওপর ঝকঝকে, আরো নূতনত্ব—গায়ে তার একটা সেমিজ ! বললাম, কি রে কমলা, কেমন আছিস ?

কমলা যেন কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। মিস্ত্রী গোছের লোকটাকে সে বললে বালতিটা নিয়ে তুমি এগোও, আমি আসছি।

লোকটা ক্রুর দৃষ্টিতে বারকয়েক আমার দিকে তাকালো, তারপরে মুখে একটা অর্থসূচক ঔঃ শব্দ করে বালতিটা নিয়ে

পাশের বস্তিটার ভেতর ঢুকে গেল। আমারও কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগলো। এত সে কমলা নয়, এ যেন অন্য মেয়ে!

কমলা বললে, নিত্য আর কে যেতে দেবে বাবু? ও লোকটা বললে, আয় আমার সঙ্গে, ঘর আছে থাকবি, দু'টো রাঁধাবাড়া করাবি নিজেও খাবি, আমাকেও দিবি। কি আর করি?

জিজ্ঞাসা করলাম, ও কে, কি করে?

—টিনের মিস্ত্রী, খুব বড় মিস্ত্রী বাবু, অনেক পয়সা রোজগার করে। তবে স্বভাব ভালো নয়, মদটদ খায়। অন্য দোষও আছে।

বললাম, হু। তা তোর মেয়েটা কেমন আছে?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে কমলা বললো, মেয়েত মরে গেছে!

চমকে উঠলাম-সে কি? অমন নাদুস নুদুস মেয়ে, কি হয়ে মারা গেল এই ক'দিনের ভেতর?

কমলা বললো, কিছু হয়নি। না খেয়েই মলো।

—কেন তোকে যে বলেছিলাম রোজ ওর জন্যে দুধ নিয়ে যাবি আমার ওখান থেকে। কেন যাস নি?

—ইচ্ছে করেই যাই নি বাবু!

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কমলা নিজে থেকেই বললে, কি করি বাবু, নিজেই আমি জলে ভাসছি—ঐ কচি বাচ্চা নিয়ে এর ওপর আবার যাই কোথায়? দু'দিন একদিনের ত কাজ নয় আস্ত কাল পড়ে আছে। শেষে মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে না গাইয়ে রাখলাম—তারপর ঝাড়া হাত-পা হল!

রাগে আর ক্ষোভে তখন আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। বললাম, তুই বেটী আস্ত খুনী, তোকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙানো উচিত। কেন তুই আমায় দিয়ে এলি না মেয়েটা?

আহম্মকের মতো মুখ করে কমলা বললে, হ্যাঁ বাবু, কাঙালের মেয়ে তোমরা নিতে কিনা? তারপর একটু থেমে সে বললো, ঢের লোকই ত ডাকতো রোজ—কিন্তু ঐ আপদকে কেউ নিতে চাইতো না। সব্বাই বলতো ওটাকে শেষ করে দে। কি করবো আমি? শেষটা মেরেই ফেললাম।

কথাবার্ত্তা কইছি, হঠাৎ দেখি সেই মিস্ত্রী পুরুষ একখানা গামছা পরে আর এক দফা বালতি হাতে হাজির। সে বললে, কমলাকেই সম্ভবতঃ, কি বাবা, প্রেম যে আর ফুরোয়ই না! ওসব কিন্তু চলবে না—তা বলে দিচ্ছি!

কমলা আস্তে বাস্তে বললে, যাচ্ছি বাবা, মাকে বলো আমার কথা।

তার বাবা কথাটা খটাস করে কেন জানি না কানে লাগলো। নিঃশব্দে চলে গেলাম। স্ত্রীকে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও কিছুই বললাম না, কোথায় যেন বাধতে লাগলো।

* * * *

দিন দশেক পরে অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি রোয়াকে বসে কমলা কাঁদছে এবং চৌকাঠের এপিঠে মোড়ায় বসে স্ত্রী সেলাই করছেন, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে কমলার কথা শুনছেন।

কাহিনী সংক্ষিপ্ত—কমলার মিস্ত্রী তাকে খেদিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মিস্ত্রী এবং তার দুটি ছাঁড়াতের দৌলতে কমলা কঠিন একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এখন সে যায় কোথায়, খায় কি, কি দিয়েই বা চিকিৎসা করায়।

বীণা পূর্ব্ববৎ একটি টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। শুয়ে শুয়ে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, কোথায় এর শেষ? সহস্র সহস্র কমলার জীবনেই ত দেখা দিয়েছে আজ এই দুর্বিপাক! রিনা অপরাধে মনুষ্যত্বের এই লাঞ্ছনা···কোথায় এর প্রতিকার?

তেরোশ' পঞ্চাশ

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

(২)

He who was living is now dead,
We who were living are now dying
With a little patience.

—Waste Land.

যাত্রা:

তপ্তস্বাদ বালুরাজ্যে স্বেদসিক্ত যাত্রা হ'লো সুরু
আকাশী স্বপ্নের নীড় ভেঙে' গেছে মৃত্তিকার ঝড়ে।
বিবর্ণ রাত্রির কোলে যাযাবরী বর্ষিষ্ণু পিপাসা—
বৃথাই চাঁদের সুধা খোঁজে।

ক্ষুধিত মৃত্তিকা জানি: খড়ো নীড়ে আজিও বন্দিনী,
তবু তুমি স্বপ্ন দেখ নিরিবিলি আকাশী নাড়ের!
আকাশ মৃত্তিকা মাঝে সেতুবন্ধ করিবে রচনা—
হে মৈত্রেয়ী, বৃথাই সাধনা।

সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ: ক্ষুরধার দুর্গম ধূসর।
উদ্বাস্ত মানব আর তাম্র মুখ জনতার ভীড়।
তুমি আগে চলো ভদ্রা, ফেলো' দাও স্মৃতির বোঝাটি
পশ্চাতেই পড়ে' থাক তীর।

শেষ যাম: স্থিরস্থিরে উলংগ বাতাসে
বিনিদ্র অলস চোখ তারী হয় ঘুমে;
লক্ষশত কবন্ধের ভীড় করি' আসে—
কীর্তিনাশা কামানের ধূমে।

তারি মাঝে শুনি যেন অসহিষ্ণু ক্ষিপ্র পদধ্বনি
দূর অবাহিকায়!
দুর্যোগের অবসানে আগন্তুক কালের প্রহরী
বন্দুকী বাঁশীর সুরে সোনালী উষার গান গায়।

(৩)

You are a ghost among the flares of guns
Less living than
The shattered dead, whose veins of mineral
We mine for here.

Alter your life.

—Stephen Spendor.

ঐতিহাসিক যোজনা:

আকাশে উঠেছে ঝড়: মেঘে মেঘে বজ্রের মন্দিরা—
জীর্ণ নীড়ে লুকালো পারীরা।

কলরব থেমে' গেছে একদা বর্ষিষ্ণু জনপদে।
শস্যহীন পোড়ো মাঠ—কোথা আর ফসলের গান!
জনহীন গৃহস্থালী:
রিক্তপথে দিন কাটে—যাযাবর! ভরে কই থালি!

তারা আর ফিরিবে না নিরুদ্দেশ পথের পথিক
ভিক্ষান্ন সম্বল, তবু মিলেনাতো ভিখ।
আদিম প্রাণীর মতো তৃণভোজ্যে ক্ষুধার তাড়না
মিটে কই? বাঁচিবার নেই আর আশু সম্ভাবনা।

সান্ত্বনার ভাষা নাই।
আজিকার বন্দনা বৃথাই।
সর্বগ্রাসী মৃত্যুর মিছিলে—
বণিকের স্ব-খাত সলিলে—
বুদ্ধিজীবী নাগরিক, তুমি আমি, তারাও সবাই
নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হ'বো; আজিকার মিনতি বৃথাই।

(টোকিও-বার্লিন-রোম, লণ্ডন ও ওয়াশিংটন,
সে' দিনের অপাংক্তেয় অধুনা-গর্বের ওই মঞ্চে।)

মৃত্যুর মিছিল: তারা মিছিলেরে ক'রেছে মুখর
শতাব্দীর পীঠস্থানে দেশে দেশে রচিত কবর।
সীট-ট্রেঞ্চে বাসা বাঁধো বাঁচিবার আদিম প্রয়াসে
মারণ-রথের রথী তাই দেখি' হিংস্র হাসি হাসে।

* তেরোশ' পঞ্চাশ (১)—মন্দিরা—আষাঢ়, '৫০ বাং

তেরোশ' পঞ্চাশ

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীমহেন্দ্র নাথকে]

মৃত্যুর উৎসব-যজ্ঞে যারা হ'ল নিঃশেষ-আহুতি,
কোন স্বপ্ন তারা দেখেছিল ?
বিপর্য্যস্ত এই পৃথিবীতে—
'ধূমকেতুমিব' করালের ?

তেরোশ' পঞ্চাশ !
উঠেছে উন্মাদ ঝড় পৃথিবীর বুকে।
বহিছে সমুদ্র স্রোত উত্তাল উদ্দাম।
নগর-প্রান্তর হয় ; চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায় শান্তিময় নীড়।
পথে গ্রামে জনপদে করেছে বিস্তার
মন্বন্তর কৃষ্ণপক্ষ তার।

তবু জাগে 'নষ্ট নীড়ে' মৈত্রেয়ীর নীড়ের স্বপন।
তাদের প্রাসাদ গড়া রিক্ত ধূ ধূ 'চোরাবালি' পরে !
তুচ্ছ করি লবণাক্ত সমুদ্রের ফেণিল বিক্ষোভ
মৈত্রেয়ী বাঁধিবে ঘর ! তারপর বিপর্য্যয় ফের।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে চলিয়াছে ভাঙা আর গড়া।

কাঁপিছে প্রলয় রাত্রি, যাত্রীদল যাত্রা করে সুরু ;
দুর্নিবার প্রভঞ্জন, তীব্র তবু চলার পিপাসা।
সম্মুখে পশ্চাতে মৃত্যু, মৃত্যু চারিদিকে।
আর্ত্ত ক্লিষ্ট মুমূর্ষুর মর্ম্মভেদী অস্ফুট বিলাপ।
কালিন্দীর কলস্রোত, মহাকাল হাসে অট্টহাসি !

সাবধানী যাত্রী নহে ; পথ নহে মসৃণ সরল।
বেহিসাবী মন নিয়ে চলিয়াছে কোটী পদাতিক।
পদধ্বনি সমতালে ধ্বনি ওঠে পৃথিবীর বুকে।
নিঃশঙ্ক নির্ভীক চিত্ত, স্বপ্নাবিষ্ট তন্ময় বিহ্বল,
ত্রস্ত ও সন্ত্রস্ত নয়, জ্যোতির্ম্ময় মুক্তির প্রতীক।

শোন ওই, আকুল হইয়া ওঠে রক্তাপ্লুত পথের আহ্বান !
উপল বন্ধুর পথে যুগান্তের কঠিন সঙ্ঘাত।
শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে, ঝরে যায় জীর্ণ পুরাতন।
নিষ্পত্র অটবীশাখে সম্ভাবনা নবপত্রিকার।
চেতাবনী ব্যর্থ সেথা, বৃথা তব সাবধানবাণী।

দীর্ঘ পথ অন্ধকার আবরণে ঢাকা,
সে পথের যাত্রী নহে 'চেতাবনী শাসিত সৈনিক'।
সেই পথ দুর্জ্জয়ের—উদ্ধত উন্নত শিরে চলিবার পথ।
দুর্দ্দৈবের আস্ফালন, দুর্নিবার ধ্বংসের ভ্রূকুটি
দুর্দ্দিনে করিয়া তোলে—সেই পথ বিভীষিকাময় !

দীর্ঘ পথ ! এস বন্ধু, বেহিসাবী মন নিয়ে পথে।
শুনায়ো না সাবধানবাণী !
সিন্ধু স্রোত হতে ক্ষরে মধু,
জল স্থল অন্তরীক্ষ আজো মধুময়,
কালকূট, সেও যে অমৃত হয় যুগ-প্রয়োজনে !
'শূন্য শেষ বিভীষিকা' নহে,
শূন্য শেষ—নবতর সংখ্যার সূচনা।

তেরোশ' পঞ্চাশ

আবুল হোসেন

যখন মনে পড়ে
রুক্ষদিনের রুদ্র দাহে
ফুটপাথে বিবর্ণ গলিত শব
মোড়ে মোড়ে যতদূর যাই,
চোখে চোখ পড়ে, এখনো রয়েছে চেয়ে
ক্ষুধার্ত জলন্ত চোখে
অস্থিসার মৃতদেহ
সেই পথে
যেখানে তোমার জড়োয়া কোচা ধুলোয় লুটোয়
সোনায় রূপোয় মোটারে জুড়িতে
প্রাণ জুড়োয়।—

যখন মনে পড়ে
আগুণ জলে শিরায় শিরায় দমনীতে।

মৃতপ্রাণ, রুগ্ন দেহ, শূন্যমন
হতচেতন জাগবে কবে, জাগবে কবে ?
ব্যর্থ কাঁদন
অরণ্যে আর শব্দহীন যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরবে না,
ঝরবে না আর যুগপ্রাণ ঝড়ের আগে।

জ্যোতির্ম্ময় সেই দিনের সূর্য্যালোক
ব্যাপ্ত হোক ব্যাপ্ত হোক
তোমার চোখে আমার চোখে শতাব্দীর এই ব্যথায় শোকে।

দিবাস্বপ্ন

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটী বিরাট প্রাসাদ।
বিরাট আর প্রশস্ত রাজপথ ;
অতিকায় ঘোটকেরা চ'লেছে পথে
পিছনে বৈতালিকের মিলিত পদশব্দ।
দিবসের ক্লান্ত সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে
তাদের শিরস্ত্রাণে,
মহা উৎসাহে তারা নগর-পথ অতিক্রম করছে !

দূরে প্রাসাদের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ;
কুমার শ্বেতকেতুর আজ অভিষেক !
স্বর্ণ-কলসে ভারীরা বহন ক'রে এনেছে
সপ্ত-সমুদ্রের পুণ্য জলধারা
তাতে স্নান করবেন আমাদের কুমার।

রাজ্যে নাকি প্রশস্ত শান্তি নামবে,
মহাগণক ঘটকর্পর এ-কথা গণনা
ক'রে ব'লেছেন !
বিদেশী শত্রুর নিপাত অবশ্যম্ভাবী !
মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম সেই অপূর্ব
জন-যাত্রার দিকে !
কে যেন আমাকে ঠেলে দিলে
ঘুম ভেঙে গেলো !
তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে দেখ্‌লাম,
কতোগুলি মানুষ চ'লেছে পথ দিয়ে
অসংখ্য নর-নারী। চোখে তাদের গভীর নৈরাশ্য
হাতে আছে একটী ক'রে বস্ত্র পেটিকা !

জানা গেলো,
দক্ষিণ দেশ থেকে এরা এসেছে
রাজ দরবারে তণ্ডুল সংগ্রহে ;
তিনদিন উপবাসের পর যদি আজ ভাগ্য ফেরে
তাই এই বিরাট অভিযান !

চেয়ে রইলাম !

আটলান্টিকের এক রাত

শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

শ্যামলা মেয়ের কাজল চোখের মত চেয়ে আছে সাগর। অকূলে লুকান তার শত রহস্য, চির যৌবনোন্নত বক্ষ তার উন্মাদনায় দোদুল। অশান্ত সাগরের প্রতি তরঙ্গ ভঙ্গে সৃষ্টি ও প্রলয়ের পদধ্বনি। 'কালো' বলে বাতাস তাকে ব্যঙ্গ করে, সে ক্ষেপে যায় পাগলের মত। রাগ করে বাতাসের মুখে সে ছড়িয়ে দেয় সিকর। বাতাস সোহাগে তাই বুকে ধরে ছুটে যায়।

সহস্র ফণা নাগিনীর বিস্তারিত ফণার মত অর্দ্ধবৃত্তাকার সারিতে ছুটে চলেছে সাবমেরিণ বহর। চারিদিকে লীলাময়ী আটলান্টিকের উন্মত্ত কালো জলরাশী। সাবমেরিণের রেলিং ধরে বার্গাস একমনে দাঁড়িয়ে দেখছে মহাসাগরের বিচিত্র খেলা।

সাগর-সীমান্তে সূর্য্য এঁকে দিয়েছে অলক্ত আভা। দিক্ সধীরা আঁচল উড়িয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। সূর্য্যের লাল মুখে সাগরের কাল চুম্বন টেনে দিল গোধূলির যবনিকা।

দূর পাল্লার কামানগুলি সাবমেরিনের পিঠে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলী সঙ্কেত করছে দূরের দিকে। ইস্পাতের মূক দৈত্যগুলি যেন সাগরের শাসক। চঞ্চল আবর্ত্ত উল্লাসে ছুটেছে সাবমেরিণের বিপরীত গতিপথে। বার্গাস হাতের পোড়া সিগারেটটি আবর্ত্তের মুখে ছেড়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল মুগ্ধ বিস্ময়ে, দুলে দুলে কেমন তা ছুটে যায়। ছেলেমানুষী তার একটুও কাটেনি, হয়ত মনে পড়ছিল স্রোতের জলে কাগজের নৌকা ভাসাবার ইতিকথা।

কাল সাগরের বুকে রাতের কাল জমেছে গাঢ়। বাইরে যারা ছিল সবাই ফিরে এল-ভিতরে। কাফির গরম কাপ ঘিরে তারা হ'য়ে উঠল মুখর। নিরীহ প্রকৃতির বার্গাস বয়সে সবার চেয়ে ছোট। একান্তে সে মুখ গুজে বসে আছে কাফির অপেক্ষায়। পরিচারিকা 'আনা' ক্ষীপ্র হাতে পরিবেশন করছে কাফি, সঙ্গে সে উপহার দেয় একটু হাসি। সৈনিকদের কাছে সে হাসিটুকু গরম কাফির চেয়ে কোন অংশেই কম উত্তেজক নয়।

সৈনিকের কঠোরতার মাঝে 'আনা' আজও জাগিয়ে রেখেছে একটু কোমলতা। অক্লান্ত পরিশ্রমী সে, যন্ত্রের মত সদা কর্ম্মচঞ্চল। তবুও যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের যেন আবদারের আর অন্ত নাই। কাফিতে চুমুক দিয়েই কেউ বাজনা ধরে—একখানি গান, কেউ ফরমাস করে একটা নাচ, কেউ বা গাল ফুলিয়ে আবদার করে—পিয়ানোর সঙ্গত না হলে নাচ বা গান কিছুই জমে না। এসব 'আনার' কর্ম্মতালিকার বাইরে হ'লেও, প্রায়ই সে তাদের নিরাশ করে না। বাইরের সাগর থাকে বাইরে, ভিতরে উৎসব আঙ্গুর-মদিরার ফেনার মত উপচে পড়ে।

বেজে উঠল আহ্বানী সঙ্কেত। যে যার ঘরে ফিরে গেল পোষাক পরিবর্ত্তন করতে। দশ মিনিটের মধ্যেই যে যার কাজে হাজির হ'তে হ'বে, অন্যদল পাবে ছুটি। 'আনা' কাপগুলি তুলে নিল, একটু পরেই সব হৈ হল্লা করে আসবে।

বার্গাস ঘাড় হেঁট করে যাচ্ছিল কাজে। দোরের পাশে আনার সঙ্গে বেপরোয়া ঠোকাঠুকী। আনার হাতের কাপ পড়ে ভেঙ্গে গেল। কাঁজাল স্বরে একটা গালি দিয়ে আনা বার্গাসের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। গালির জন্য বার্গাস ভাবে না। সবাই তাকে বোকা বলে, আনা না হয় বোকা বাঁদরই বলেছে। চড়টার জন্যও তার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তার ত্রুটির জন্যই বরং দুঃখ জানিয়ে সে বিদায় নিল। আনা তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, সত্যিই বার্গাস বোকা!

বার্গাস পর্য্যবেক্ষণ ঘরে পেরিস্কোপের সামনে গিয়ে বসল। এতক্ষণ যে কাজ করছিল অবসরের আনন্দে সে করমর্দ্দন করে বিদায় নিল। পেরিস্কোপে একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল—সীমাহীন সাগর শুধু কালো আর কালো—।

বার্গাসের দু'পাশে দু'টি নল মুখ ব্যাদন করে আছে। একটি এসেছে উপরের কমাণ্ডারের ঘর হ'তে, অপরটি নেমে গেছে কলঘরে। পেরিস্কোপে সে যা কিছু দেখে তাই কমাণ্ডারকে জানায়। প্রয়োজন হ'লে কমাণ্ডারের আদেশও কলঘরকে জানাতে হয়।

পর্য্যবেক্ষণ ঘরের উপরেই কমাণ্ডারের ঘর। অতল আটলান্টিকের মত কালো একখানা বড় কাগজের উপর সাদা রেখায় মহাসাগরের মানচিত্র। কোথায় কত জল, কোথায় চোরা পাহাড়, কোথায় বা প্রবাল দ্বীপ—এমনি জল-তলের অনেক রহস্য মাহুষ তুলীর আঁচড়ে ধরে রেখেছে কাগজে। কমাণ্ডারের সহকারীরা সবসময় মানচিত্রের উপর পড়ে আছে ঝুঁকে। প্রয়োজন মত মানচিত্রের জায়গায় জায়গায় লাগিয়ে দেয় আলপিনের ক্ষুদে পতাকা, তা কিসের চিহ্ন তারা ছাড়া সাধারণ বুঝতে পারেনা। সাবমেরিণের সমস্ত বিভাগ চালিত হয় এ-ঘরের ইঙ্গিতে। ওদের আলোচনার অনেকটা পর্য্যবেক্ষণ ঘর হ'তে শোনা যায়। সব সময় আদেশ না পেলেও আলোচনা অনুসারে বার্গাস পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে দেখে।

—বাম দিকে দেখ। আদেশ এল।

—অস্পষ্ট আলোর যেন আভা একটা আভা—বার্গাস উত্তর দিল।

জল পরিমাপক যন্ত্রের কাঁটা নড়ে উঠল। সাবমেরিণ ডুব দিচ্ছে। একশ, দু'শ, তিনশ', চারশ', পাঁচশ'। পাঁচশ ফুট জলের তলা দিয়ে চলেছে সাবমেরিণ। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছনা, সে কিন্তু জলের উপরের সব দেখে।

সমান দূরে আলোর আভা ভেসে চলেছে পিছন দিকে। দূরে আরো দূরে—অনেক দূরে,—আর আভা দেখা যায় না। জল পরিমাপকের মিটারের দিকে বার্গাস তাকাল। নির্দ্দেশক কাঁটা আস্তে আস্তে শূন্য মানে গিয়ে দাঁড়াল। সাবমেরিণ আবার জলের উপর উঠেছে।

কমাণ্ডারের ঘরে কি একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে। বার্গাস পেরিস্কোপে দৃষ্টি রেখে সতর্ক কান উপরের ঘরের দিকে রাখল। কেউ বলছে—এখনো হাজার মিটার দূরে, কেউ বলছে—তারও বেশী, কেউবা বলছে—তার চেয়েও কম দূরে।

বার্গাস খবর দিল—আকাশে বোধ হয় মেঘ জমেছে।

—বেরোমিটারে তেমন কিছু ধরা পড়ছেনাত!

—দিগন্তে যেন বিজলী চমকাচ্ছে।

—সতর্ক দৃষ্টি রাখ।

উপরে আলোচনা আরম্ভ হ'ল—নিশ্চয়ই আর দূরে নাই। গোলন্দাজদের উপরে যাবার আদেশ দেওয়া হ'ল, বার্গাস তা শুনতে পেল। অপলকে সে চেয়ে রইল সাগরের অন্তহীন কালোর দিকে।

আকাশের একটি তারার মালা যেন ছিঁড়ে পড়েছে জলে। কোন বিরহিনী দেবীতার দয়িতের উদ্দেশ্যে গেঁথেছিল এই মালা, যুগান্তের প্রতীক্ষার পরে সে অভিমানে বুঝি বিসর্জ্জন দিয়েছে মহাসাগরের জলে। আভাহীন বিমর্ষ আলোকমালিকা সাগর তরঙ্গের উপর দুলে দুলে ভেসে আসছে। একটু একটু করে তারা ফিরে পাচ্ছে জ্যোতি—বার্গাস সবই কমাণ্ডারকে জানাল!

কালোর বুকে জ্বলে উঠল আলোর দীপালী। সব কয়খানি সাবমেরিণ 'হ'তে জলস্থ গোলা আলোকমালিকাকে জানাল নির্ম্মম সম্ভাষণ! দপ্ করে নিভে গেল আলো, শুধু গোলার মুখে এল তার প্রতি-সম্ভাষণ। অন্ধকারে নিষ্ফল আক্রোশে গোলাগুলি ফেটে পড়ল সাগরের জলে। মানুষের অত্যাচারে সাগর উঠল কেঁদে।

মুহূর্ত্তে এদিকের সম্ভাষণ শান্ত। সাবমেরিণ ডুব দিল জলের তলায়—অনেকখানি জলের তলায়। সাবমেরিণগুলি দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ছুটে চলল শত্রুকে দু'দিক হ'তে যুগপৎ আক্রমণের চক্রান্তে। তখনো শত্রুজাহাজ হ'তে বেপরোয়া গোলা ছোঁড়া হ'চ্ছে সাবমেরিণের পূর্ব্বস্থান লক্ষ্য করে। এদের তাতে সুবিধাই হ'ল। অগ্নুৎগীরণ লক্ষ্য করে ছুটে চলল সাবমেরিণ।

বার্গাস টর্পেডো ছোঁড়ার আদেশ শুনতে পেল। সে পেরিস্কোপের কাঁচ আবার মুছে নিয়ে ফলাফলের দিকে চেয়ে রইল বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে।

গুড়ুম্! গুড়ুম্!!

সাত সাতবার সাগরের বুকে সজীব হ'য়ে উঠল অতি বিস্ফোরণের ভয়াল ছবি। চাঁদসদাগরের সপ্ত ডিঙার মত জলস্থ সাতখানি বাণিজ্যজাহাজ চঞ্চল আবর্ত্তের স্মৃতি রেখে রচনা করল সলিল সমাধি। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনখানা উঠল জ্বলে। উঃ—আরও একখানা।

ধ্বংসের প্রত্যুত্তর এল প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়ে। এবার সাবমেরিণের পালা। প্রতিপক্ষ হ'তে বেপরোয়া ডেপথ্ চার্জ্জ আরম্ভ হল। জলতলের প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে সাবমেরিণ বিপুল বেগে উঠে কেঁপে। দোল খেয়ে টর্পেডো হ'য়ে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট। সমুদ্রের জল অসহায় আর্ত্তনাদে ছড়িয়ে পড়ে শূন্যে।

কমাণ্ডার আদেশ দিল—দ্রুত নিচে নেমে যাও।

হাজার, বারশ, চৌদ্দশ, দু'হাজার—আরও, আরও বেশী। বার্গাস চেঁচিয়ে উঠল - কমাণ্ডার।

—উপায় নেই, আরও নিচে—

জল পরিমাপকের কাঁটা চরম মানে দাঁড়িয়ে সভয়ে কাঁপছে। হাতছানি দিয়ে সে যেন জানিয়ে দিল বিপদের সঙ্কেত। বার্গাস পাগলের মত ছুটে গেল কমাণ্ডারের কক্ষে। দোরে পাল্লা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সে চিৎকার করে উঠল—কমাণ্ডার !!

—চুপ্।

—আর নিচে গেলে সাবমেরিনের বর্ম্ম জলের চাপে ফেটে যাবে—

—অপদার্থ ! চুপ্।

—কমাণ্ডার !!!

—যায় যাক্। উপায় নেই।

অপদার্থ বার্গাস অবনমিত শিরে নেমে এল নিজের কক্ষে। ভীষণভাবে সাবমেরিণ দুলে উঠল কয়বার। কমাণ্ডার কলঘরকে আদেশ দিল—চরম শক্তিতে এগিয়ে চল, আর নিচে যেও না।

অসহায় আর্ত্তনাদের মত কলঘর হ'তে প্রত্যুত্তর এল—গতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অত্যধিক ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিন বিকল। জাহাজ ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে।

—উপরে উঠার চেষ্টা কর।

কলঘরের লৌহ ঘর্ষণে অদ্ভুত জড়িমা। সবাই উৎকর্ণ হ'য়ে রইল কি সংবাদ আসে। খানিক পরে সংবাদ এল—আর তা সম্ভব নয়।

সবার মুখে নেমে এল বিষাদের যবনিকা। কমাণ্ডার ছুটে গেল কলঘরের দিকে। বার্গাস তাকে অনুসরণ করল। ম্লান মুখে ইঞ্জিনিয়ার তাকিয়ে আছে ঘূর্ণায়মান বিরাট এক চাকার দিকে। তার গতি পরিবর্ত্তনে জাহাজ উপরে উঠবে; কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কমাণ্ডারকে বুঝিয়ে দিল—যদি এ চক্রে গতি বন্ধ করা সম্ভব হয় তবে অল্প সময়েই সে মেরামত করতে পারে।

দাঁড়িয়ে চিন্তা করার অবকাশ নাই। দ্রুত জাহাজ যাচ্ছে তলিয়ে। জলের চাপ যেন ইস্পাতের বর্ম্ম সইতে পারছে না। কমাণ্ডার ডাকল—কেউ পার এ যন্ত্র দানবের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে ?

পরস্পর পরস্পরের অসহায় মুখের দিকে তাকাল। সাড়া কোথাও পাওয়া গেল না। অপদার্থ বার্গাস একাস্তে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল যন্ত্রের দিকে। ধীরে সে এগিয়ে এল কমাণ্ডারের পাশে। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল—আমি পারি কমাণ্ডার !

—কি পার-?

—বন্ধ ক'রে দিতে চক্রের গতি।

বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে কমাণ্ডার বলল—তুমি পার !

—হ্যাঁ, পারি।

কমাণ্ডারের মুখের বিস্ময়ের ভাব তখনো কাটেনি। যন্ত্রচালিতের মত বার্গাসের সঙ্গে সে করমর্দ্দন করল। কমাণ্ডার বুঝতে পারল না, কেমন করে তা সম্ভব ! বার্গাস এগিয়ে গেল চক্রের দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই চেয়ে রইল তার দিকে। যাবার পথে বার্গাস টুপী খুলে সকলকে জানাল অভিবাদন। বিস্ময় বিমূঢ় জনতা শুধু চেয়েই রইল।

বার্গাস চক্রের পাশে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি আঁখি তখন পলকহারা। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে চক্রের ধারাল দাঁতের তলে। সবাই আর্ত্তনাদ করে উঠল। আর্ত্তনাদের বক্ষ দীর্ণ করে উঠল ক্ষীণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ—ক-মা-ণ্ডা-

প্রবল একটা ঝাঁকুনীতে চক্রের দাঁত বার্গাসের দেহ টেনে নিল; কিন্তু বেশী দূর তাকে যেতে হ'লনা। তাকে দাঁড়াতেই হ'ল বোকা বার্গাসের রক্তাক্ত দেহপিণ্ডের উপর।

ইঞ্জিনীয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই যন্ত্র ঠিক করে নিল। কমাণ্ডার বুকে তুলে নিল প্রাণহীন বার্গাসের শতছিন্ন দেহ। ধীরে ধীরে আবার সাবমেরিণ উঠতে লাগল উপর দিকে।

হলঘরের মাঝখানে বার্গাসের শব কমাণ্ডার নামিয়ে রাখল। জাতীয় পতাকা দিয়ে শব ঢেকে দিয়ে কমাণ্ডার তার শিয়রে টুপী রেখে জানাল বীরের যোগ্য সম্মান। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তার ধ্বনিত হল—বেঁচে থাকতে যাকে কেউ সম্মান করেনি, মৃত্যু তাকে এনে দিল অতিমানুষের সম্মান।

ইকড়ি মিকড়ি

শ্রীক্ষিতীশ রায়

এলো রে ভাই সত্য যুগ
কাটলো কলিকাল
দশবারো গুণ বেশি দামে
বিকোয় দেখি চাল।
করতে হয়না কাজকর্ম
বালিগঞ্জের হাটে
ঘণ্টা বাইশ ঠাঁই দাঁড়িয়ে
কিউ ক'রে দিন কাটে।
বেজায় রগড় হ'বে রে ভাই
কত্তা যদি দেন
ছত্তর খুলে বিনি পয়সা
ভাতের বদল সেঁন।
রাঁধা বাড়ার নেইকো বালাই
মিলছে নাকো কয়লা
খোলারাস্তায় ডেরা বাঁধি
হোকনা কিছু ময়লা।

সত্য যুগের আরেক মজা
শোনো এবার বলি
বেদস্তরী কাপড় পরা
এ নয় যেনো কলি।

ঢাকাঢুকি চলবে নাকো
সবই খোলা মেলা
আদুড় গায়ে থেকো রে ভাই
সকাল সন্ধে বেলা।

জাহান্নমে ইচ্ছে যেতে
থাকে যদি থোড়া
কিনো গিয়ে সস্তা কাপড়
দশবিশ টাকা জোড়া।

সত্য যুগের মাহাত্যি যে
বলবো কতো আর
বাইরে আছে জোচ্চোর গুণ্ডা
সাধু পগার পার
এ যুগেতে সত্যি কথা
বলতে জেনো মানা
কান থাকতে কালা সবাই
চোখ থাকতে কানা।

ঝড় তুফানে উজোড় কাঁথি
দামোদর এল ধেয়ে
দিল্লি-শিমলে তোফা আছে
দিব্যি নেচে গেয়ে।
মারলে মানুষ স্বর্গে যাবে
পাপ করলে পুণ্যি
শিবের বদল দেবতা হ'ল
ভূত আর শঙ্খচুন্নি।

সত্য যুগের মহিমে ভাই
আর যে কতো আছে
সবার সেরা মহিমে তার
না খেয়ে লোক বাঁচে।

কাজল-কালি

আপনার আদর্শ
চিন্তাধারাকে
আখরে অমর করুক।

কেমিক্যাল এসোসিয়েসন (কলিকাতা) লিঃ
৫৫নং, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আরেকটি সামরিক অধ্যায়*

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার পদাতিক বৃত্তি! তবে রাস্তা এবার অনেকটা সমতল, দৈর্ঘ্যে নয়, প্রস্থে। ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে এঁকে-বেঁকে।

প্রথম থেকেই এ-অভিযানে ঘোষের মনের সায় নেই। নেহাৎ জেরে পড়ে জুড়ি হয়েছে মাত্র। সপ্তাহের এই একটি মাত্র ছুটির দিন স্বাবাথ্ ডে'র প্রাতঃকালীন সুদুর্লভ নিদ্রা আর মাত্রাতিরিক্ত ভোজন সমারোহটি পরিহার করে ঝুটমুট শরীর ঘামানোকে ও রীতিমত বিতৃষ্ণার চোখেই দেখে। ওর মতে এটা হিট্‌লারিজ্‌মেরই নামান্তর!

হঠাৎ প্রশ্ন করলে, ক'-ক' মাইল হবে বল্‌তো?

—Length? কমল বললে, মানে দূরত্ব? Only five miles. এদিকে মেজকার এক-টুও ইদিক-উদিক হবার জো নেই। হাজার হলেও মেজকা নিজে—

বলে রাখা ভালো যে ঐ মেজকার কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়েই কমল আমাদের এই অভিযানে প্রলুব্ধ করে তুলেছে। বিশেষ-রূপে-খ্যাতনামা একজন ভূপর্যটক তিনি, ভূপৃষ্ঠস্থ এমন স্থান নেই যেখানে তাঁর পদধূলি পড়েনি। এবং তারই ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ দার্জিলিঙ্ পর্যটনে এসে গিয়েছিলেন তিস্তার বাঁক পর্যন্ত। জায়গাটির নাম রঙ্‌গিঠ্—ব্রিটিশ ভারতের শেষ সীমান্ত সিকীমের প্রান্তে। শুধু শুষ্ক এ্যাড্‌ভেঞ্চার নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভারের যে বিপুল বর্ণনা কমলের মার্ফৎ আমরা এতকাল পেয়ে এসেচি তাতে ক'রে আমাদের পক্ষে বিগলিত না হয়ে গত্যন্তর ছিল না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন অবান্তর! কারণ দার্জিলিঙের যান্ত্রিক পরিবেশেও ধ্যানমৌন হিমালয়ের নিবিড় সৌন্দর্যের অখণ্ড সত্তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। টাইগার হিলের পেশাদারী সূর্যোদয় দেখেও যদি প্রকৃতি প্রেমের চরম পরিচয় দিয়ে থাকতে পারি, তাহলে সুদূর রঙ্‌গিঠ্ যে রোমাঞ্চিক হাতছানিতে আহ্বান জানাবে তাতে আর কি আছে বিস্ময়ের? তাছাড়া পায়ে হেঁটে ভারতের শেষ সীমান্তে উপস্থিত হবো, এ ভাবতেও যে রোমাঞ্চ জাগে! ভারতের স্বাধীনতা কবে আসবে জানিনে, কিন্তু অন্তত কয়েকঘণ্টার জন্যেও পরাধীন দেশের শতকরা নিরানব্বুই জনের একজন হয়ে, শ্বশুর অথবা পৈত্রিক বিত্তে নয়, স্বপ্রচেষ্টায় স্বাধীন সীমান্তে পদচারণা করতে পারবো এ ভেবেও যে শান্তি।

হাসপাতালের নিচেই মিঠুর চায়ের দোকান। এ দেশের চায়ের দোকানের বৈশিষ্ট্য আছে। দোকানে চায়ের আনুসংগিক, আনাজ তরকারী এবং গোপনে 'রক্সি', 'কাহু', 'জাঁড়' প্রভৃতি দেশি সরাব ও তারো আনুসংগিক মুদ্রালভ্য।

উনুনে আঁচ পড়েছে। ভেজানো দরজা জানালার ছিদ্র দিয়ে ধোয়া বার হয়ে বাইরের কুয়াশাকে কঠিন করে তুলছে।

দরজার সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম। তাপমান-যন্ত্রে তিরিশের ওপরে তো নয়-ই। শরীরে উত্তাপ সৃষ্টির প্রয়োজন।

গলার আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এল মিঠু আর কামি। বছর সতেরো আঠারোর কিশোরী মেয়ে মিঠু, কিন্তু লীলা-চাপল্যে আজো সে বালিকা। কারণ-অকারণে তার সংগত অসংগত অদ্ভুত ছেলেমানুষি আমাদের পূর্ব জীবন স্মরণ করিয়ে দিত বারবার। তাই, কয়েক শ' গৃহ-বিচ্যুত সৈনিক নিয়ে এই ক্ষুদ্র চায়ের দোকানটি এক আশ্চর্য-সুন্দর শান্তির নীড় গড়ে তুলেছিলো, যার চারিপাশে পারিবারিক পরিবেশ, ভিতরে আত্মীয়তার আবহাওয়া। কাঞ্চি মিঠু আমাদের বহিন, কেডা কামি আমাদের ভাইয়া, ওদের চিরুরুগ্ন জননী আমাদের মাইজি। সময়ের প্রতিকূলতায় দুটি বিভিন্ন জাতির একাত্ম হয়ে যেতে একটুও বাধে নি।

চা' পান শেষ হলো।

ঘুমের নিমীল জড়তায় ছোট ছোট চোখ দুটি বিস্ফারিত

* একটি সামরিক অধ্যায়—মন্দিরা—অগ্রহায়ণ : ১৩৪৯

করে মিঠু বললে, তোমরা তা হলে দাজু সত্যি চললে? স্বর নামিয়ে ও চোখকে আবার সক্রিয় করে তুললো। বলা যেতে পারে অযুত বিস্ময়ের বন্যা এনে আমাদের প্লাবিত করে দিতে লাগলো। আমাদের বহু সন্ধ্যার বহু আলোচিত ও রোমন্থিত প্রস্তাবটা যে অবশেষে সত্যি কার্যকরী হতে চলেছে, তা যেন ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়!

—এই না হলে ফৌজি! বার কয়েক আমাদের প্রদক্ষিণ করে প্রশস্তি জানালো কামি।

—উৎরাই-এ তো কোনো তকলিফ্ নেই, দশ 'মিল' রাস্তা এক কদমে—

—দশ মাইল! ঘোষ আর্তনাদ করে উঠলো। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, কিরে কমল, তুই না বলেছিলি পাঁ-পাঁ-পাঁচ মাইল, অ্যাঁ?

—আরে রেখে দে ওসব flying news. বিরক্ত হয়ে কমল বললে, আমার মেজকা নিজে একজন জিওগ্রাফিস্ট্। হুঁ······যত্তো সব। চলে আয়—

ওরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো ছবির মতন। আমরা পা বাড়ালুম সম্মুখে। অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে মিঠুর তরুণ মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠেছে। তার কলকাকলি শুব্ধ। নির্বাক নয়নে যেন সে আমাদের এই অগ্রগমনকে প্রীতির অভিবাদন জানাচ্ছে।

এতদিন এসব রাস্তা ছিল আউট অফ বাউণ্ড্ ফর ট্রুপ্‌স্। বিনানুমতিতে আসবার হুকুম ছিল না আমাদের। কিন্তু আদমের বংশধর আমরা। তাই হয়তো বহু রাত্রে রাত্রির প্রহরীকে (night sentry) ফাঁকি দিয়ে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনেই বেরিয়ে পড়েছি ব্যারাক ছেড়ে, অন্ধকার কিম্বা জোছনায় একক অথবা সসংগী ইতস্তত: ঘুরেছি হেতুহীন। হয়তো কোনো কাকজোৎস্নায় ভেতর থেকে কে যেন বললে, বেরিয়ে এসো এ ব্যারাক ছেড়ে, একবার গিয়ে দাঁড়াও প্রকৃতির উন্মুক্ত উদারতায়—দেখবে চারদিকের পথে ও প্রান্তরে পাহাড়ে ও পর্বতে গলিত চন্দ্রালোকের শান্ত সুন্দর সমারোহ। দিনের কঠোর কোলাহল ঘুমিয়ে পড়েছে দুষ্ট ছেলের মতন, আর রাত্রির ভাষাহীন নৈস্তব্ধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে ঘুমন্ত প্রকৃতি।

···ইত্যাকার সব নিওরেটিক কবি কল্পনা, সুস্থ মস্তিষ্কে যার অর্থও নেই, জিজ্ঞাসাও নেই। যা কেবলমাত্র বিস্ময়, বিশ্লেষণ চলে না। এই বিস্ময়ের বন্যায় কতো রাতে ভেসে গিয়েছি, ব্যারাক ছেড়ে অজান্তে কখন এসে দাঁড়িয়েছি ছোট্ট উপত্যকার মতন সেই স্বল্পপরিসরে।—

তারপর, তারপর এক সময় যখন ফিরে এসেছি ব্যারাকে তখন মনে হয়েছে, কই, চাঁদের আলোয় প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতি তো ঘটলো না! মোহগ্রস্তের মতন কেটে গেছে কতগুলি নিশ্ছেদ মুহূর্ত! এ কার চক্রান্ত? নইলে আমার জানালার শিয়র দিয়ে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপোলি চুড়োটি আকাশের 'পরে চোখ রেখে ঝল্‌মল্ করতে থাকে, পাশাপাশি পাহাড়-গুলোর মধ্যবর্তী কালো কালো ব্যবধানরেখারা যখন আলো-ছায়ার বিচিত্র সুন্দর পটভূমিকা রচনা করে করে অনুচ্চারিত প্রেমের মতন রহস্যময় হয়ে ওঠে, তখন আমি কিনা নিতান্ত আহাম্মকের মতন—

আজ তাই এপথ একেবারে অভিনব মনে হতে লাগলো। এক একটি পথের মোড় যেন এক একটি নবীন আবিষ্কার: বাঁদিকে পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর, ডান দিকে খাদ। বাঁক ফেরার সাথে সাথে খাদ চলে গেলো বাঁদিকে, পাহাড় এল ডাইনে। প্রায় একশ' আটাশ স্পিডে আমরা নামছি, তাই খাদ ও পাহাড়ের এই ঘন-ঘন দিক পরিবর্তনকে ভারী আশ্চর্য লাগছে! ভা-রী আশ্চর্য। সকাল তো অনেকক্ষণ হয়েছে, কিন্তু কুয়াশা-কঠিন বায়ুমণ্ডল, সূর্য এখনো অন্তরালবর্তী। কখন হয় তো একেবারে মধ্যাকাশে এসে আচমকা ঝিলিক দিয়ে উঠবে। গতরাতে তুষারপাত হয়ে গেছে, প্রকৃতির সবুজের ওপর ছিন্নভিন্ন শাদার আস্তরণ। নিকট-দূরেই শুধু দৃষ্টি চলে, সুদূর এখনো অস্পষ্ট। ঐ খাদের ওপাশেই যেন আকাশ থেকে একটা কৃষ্ণ-ধূসর পুরু পর্দা নেমে এসেচে মাটি পর্যন্ত। এ পাশে সব একাকার, কিন্তু ওপাশেই হয়তো রয়েছে আকাশ আর পৃথিবীর চিরন্তন শূন্যতা।

ঘোষ অগ্রগামী, আমাদের ফ্রন্ট মার্কার। পেছন থেকে মনে হয় যেন একটা ভাল্লুক হাঁটছে, ঘাড়ের ওপর শুধু একটা ঘাড়-ছাটা মানুষের মুণ্ডু বসানো। একেই মোটা তায় বেঁটে,—প্রমান সাইজের গ্রেটকোট ঠেকেছে এসে এ্যাম্যুনিশন্ বুটের সংগে:

চিত্রে দেখা বরফ-ঢাকা ককেশাসে রুশ সৈনিকের ছবি যেন। তারপর পরিতোষ আর গুপ্ত, নাটকীয় জনান্তিক-ধরণের কথোপ-কথনে চলেছে—দুজনেই বিবাহিত! অতঃপর কমল মিত্তির মণিরুল—নির্ঘাৎ কমল মেজকার কাহিনী ফেঁদেছে। সেন আমার পাশে, চুপচাপ। কবিতার ভাব সংগ্রহে ব্যস্ত। সুদে-আসলে এ নৈশব্দ্যের শোধ তুলবে ভবিষ্যতে: ঈশ্বর জানেন, কতো রাত্রের ঘুম খেসারৎ দিতে হবে!

—কী সুন্দর মিষ্টিক প্রকৃতি! সহসা ও এক ঝলক কথা কয়ে উঠলো।

সমর্থন-সাপেক্ষ উক্তি এ নয়, তবু সায় দিলুম। একটু থেমে আবার অত্যন্ত অন্তরংগতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে এল সেন—

—ভারী এ্যাড্‌ভেনচ্যারাস্ হবে কিন্তু! আচ্ছা আসবার সময় মিঠুর মুখচোখের অভিব্যক্তিগুলো লক্ষ্য করেছিলি?

আমি ফ্যালফ্যালিয়ে তাকালুম সেনের দিকে। বলে কী:

—হয়তো overlooked হয়েছে। আমার হয়েই যেন ও কৈফিয়ৎ দিলে। আচ্ছা বলতো, ঐ সময় মিঠুর গলায় রবীন্দ্রনাথের কোন্ গান মানাতো?

রবীন্দ্রনাথের গান! আমার নিশ্বাস রোধ হবার জো! শুনেছি কবিগুরু নাকি গানেরো গুরু। কিন্তু বাংলার শতকরা নিরানব্বইটি রবিভক্তের মতন শুধু তাঁর নাম ও নাম-গান শুনেই এতকাল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় আকণ্ঠ গদ্‌গদ হয়ে এসেছি। এমন কী, অন্য সবার মতনই, গুরুদেবের সমালোচনা শুনলে পর্যন্ত কতবার না আমারো ইন্‌কিলাবী খুন টগবগিয়ে উঠেছে। কিন্তু চাক্ষুষ সব পড়বার প্রয়োজনও অনুভব করিনি কখনো, কারণ সেটা বাঙালি সুলভ স্বাতন্ত্র্যের ও ঐতিহ্যের এবং কেরাণি-কৌলিন্যের পরিপন্থী। আমরা শুধু ভক্ত হতে পারলেই বর্তে যাই। ভক্তির জোয়ারে যদি না হাবুডুবু-ই খেতে পারলুম তবে আত্মিক মর্মোপলব্ধি ঘটলো কোথায়? কোনোমতে নাম ভাঁড়িয়ে ভাঁড়ার ভর্তি করতে পারলেই নিশ্চিন্দি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি এবং আমরাও বাঙালি পিতৃ-সৌজন্যে—ব্যস্ আর চাই কী?

আমাকে নিস্তব্ধ দেখে সেন বললে, ঠিক মনে হচ্ছে না, না? আচ্ছা,…ধর যদি…'ওঠ ওঠ জয়রথে তব, জয়যাত্রায় যাও গো'—হেভ্‌ন্‌লি! এই সব রোমাঞ্চকর অভিযানে, সহসা ওর গলা সুরেলা হয়ে এল, মেয়েরাই তো আমাদের প্রেরণা জোগাবে। আহা, স্বপ্ন! স্বপ্ন! অভিযাত্রী পুরুষের কপালে নারীর কল্যাণ হস্ত এঁকে দিল—

সর্বনাশ! ত্বরিতে চলার গতি বাড়িয়ে দিলুম: উনিশ শ' একচল্লিশ সালের একজন ভাড়াটে সৈনিক হয়ে আজো ও স্বপ্ন দেখে নাইটহুডের! কী জানাবো, সহানুভূতি না অনুকম্পা?

—এযে খালি নামচি ত' নামছিই রে বাবা। রসাতল নাকি! বললো মিত্তির।

—এক কাজ ক-ক-করলে হয়।

সবাই তাকালো ঘোষের দিকে।

—বলছিলুম কী, খালি যখন নামতেই হবে, তখন যদি এ-এ-একেবারে গ-গ-গড়িয়ে—

এ ক্ষেত্রে হাসিটা সংক্রামক। কিন্তু ভারিক্কি চালে কমল বললে তোরা হাসচিস; ঘোষ কিন্তু indirectly আইন-স্টানের Law of Garivation-এর theory-টাই প্রমাণ করলো।

ঘোষ ইংরেজী বোঝে না। বললে, তাই বলে তুই আমায় গা-গা-গা-গালাগালি—

—দিবি! খেঁকিয়ে উঠ্‌লো কমল, পাবলিক নুইসেন্স। গালাগালি আবার দিলে কে তোকে? ইংরাজী না শিখলে এই দুর্দশাই হয়। মেজ্‌কা বলে—

লোকালয় বিরল হয়ে এসেছিলো। এবার একটা, ছোট বস্তিমতন পড়লো। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সব বাড়ি, দূর থেকে মনে হয় যেন কাৎ হয়ে আছে, কিম্বা ঝুলছে—একটু আলো-ড়নেই পড়ে যাবে, তলিয়ে যাবে অতলে। রাস্তার একপাশে একটা উঁচু টিলার ওপর বাজার বসেছে, বিক্রেতা ছাড়া ভিড় নেই। একটি দেহাতি টেলারিং সপ্, একটা চায়ের 'দোকান, কয়েকটি কুটির। ওপাশে একটা ভাটিখানা। ভাটিখানাটি নিশ্চয়ই লাইসেন্সপ্রাপ্ত, কাজেই তার বীভৎসতাও আইনীভাবে রীতি-মত প্রকট। এত সকালেও বেশ ছোট্ট একটি নিবিড় ভিড় জমেছে। দুটি মেয়ে মাটির ভাঁড়ের থেকে তরল পদার্থ পরি-বেশন করছে, এনামেলের গ্লাসে। বয়স তাদের কতো হবে? ষোলো থেকে ছাব্বিশ, চল্লিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কেশের চূড়ায় বনগোলাপের গুচ্ছ থাকলেও, ওদের চোখেমুখে চলনে-

বলনে এমন একটি সঠিকতা আছে যে এক পলকেই চেনা যায়। এদের সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা অবিশ্যি পুনরুক্তি। তবে বিস্তৃত করে বলি: এদের ক্ষেত্রে যে সার্বজনীনতা আছে ভাড়াটে সৈনিকের বেলায়ও তার অনুপস্থিতি নেই।—উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত এবং সগোত্র! আদি মনের সুড়সুড়ি এই সামাজিক পাপের কারণ নয়, হেতু সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তুগত—সমাজনৈতিক। সাম্প্রতিক সমাজ-ব্যবস্থার অসংখ্য অসংগতির এও একটি দান, দেবদাসীর এই বিবর্তণে তার দেব-পূত অংগাভরণ কেবল পড়েছে খসে, আজকের বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিকতা শুধু ভেঙে দিয়েছে এদের সংকীর্ণ গণ্ডি। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া এ যুগের নারী জীবনের মূলকেই আঘাত করে দেয়নি, পুরুষকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে। তবে এই সমাজ পুরুষ-নাগের শিরে দাঁড়িয়ে আছে বলেই ভারসাম্যের এই অপূর্ব নববিধান! কক্ষচ্যুত মেয়েদের সে-সমাজ পুরুষ জাতির সামাজিক রায়েই গড়ে ওঠে, আবার পুরুষেরই নৈপথ্যিক ইন্ধনে সেই সমাজের সর্বাংগীন অস্তিত্ব। ডায়েলেকটিকাল মেটিরিয়্যালিজম্!

শরীর ইতিমধ্যে বেশ গরম হতে শুরু করেছে, অথচ অনাবৃত মুখগুলোর ওপর তুষারী হাওয়ার ঝাপ্‌টায় শরীর অবশ হয়ে আসে।

পরিতোষ বললে, আচ্ছা ফ্যাসাদ রে বাবা,—বাইরে ঠাণ্ডা, ভিতরে গরম।

গুপ্ত বললে, যা বলেছ ইয়ার। এ্যাই মিত্তির, আমার পাকিট থেকে বের করতো সিগারেটের টিনটা।

সকলের হাত-ই গ্রেটকোটের পকেটে ঢোকানো।

হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে মিহি গলায় মিত্তির বললে, ক্ষেপেচিস! শেষটায় বেহাত্ হয়ে যাই আর কি!

—তার চেয়ে একটা মার্চিং সঙ্ ধরলে কেমন হয়? মণিরুল প্রস্তাব করলে, কোরাস গাইতে গাইতে হু হু নামা যাবে।

—The idea. লাফিয়ে উঠ্‌লো কমল, মেজকার সেই গানটা—'আমরা স্বপন পরীর দল, চল্‌রে চল্‌রে চল।' এ্যা-সা জমবে।

—আর জমিয়ে কাজ নেই বাবা, পরিতোষ কঁকিয়ে উঠলো, এমনিতেই মালাই বরফ বনে যাচ্ছি।

—কিন্তু তোর মেজকা আবার গান লিখলো কবে রে? কে যেন সন্দেহ প্রকাশ করলো।

—তবে! চোখ গোল করে কমল বললে, what you are think? যা গান লেখে মেজকা, কোথায় লাগে কবি ঠাকুর? হুঃ—!

একটু এগিয়ে এসে নিচু গলায় সেন বললে, তার থেকে বরন্ 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' এইটাই সুর করে—

হঠাৎ জ্বলে উঠ লো মিত্তির, বন্ধনহীন গ্রন্থি আবার কি হে, অ্যাঁ? সোনার পাথর বাটি পেয়েছ? যত্তোসব কবিষ্টিক্—

একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লো সেন।

—আমি-ই তাহলে catch করি, কী বলিস? কমল বললে।

—তুই? 'ব্রুটাস তুমিও' গোছের বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে পরিতোষ বললে, কি সুরে গাইবি? গলাতো অসুর।

—গলাতো অসুর! তিক্তকণ্ঠে কমল পুনরুক্তি করলে। ভারী তো সুর বুঝিস, হুঁঃ। কেন, সুর না হলে বুঝি আর গান হয় না? মেজকা বল্‌তো, ছন্দছাড়া যদি কবিতা হয়—

—দোহাই তোর, প্রার্থনার ভংগিতে মিত্তির বললে, তোর গান তবুও সহ্য হবে, কিন্তু তোর ঐ মেজকার মতামতের ফিরিস্তি আর দিসনি। তুই গান-ই গা', আমরা আত্মসম্বরণ করছি।

কমল রীতিমত অসন্তুষ্ট হ'লো, কিন্তু বেকসুর সঙ্গীতালাপের এমন সনন্দ পেয়েছে বলেই সম্ভবত নিরুৎসাহ হলো না। ক্ষণিক গোঁজ নিয়ে ও গান ধরলো। এ সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের উক্তি উদ্ধৃত করবো না। পুরাণ কাহিনীতে শোনা যায় শ্রুতিমধুর সংগীত নাকি কোন পাষাণ দেবতাকেও টলায়মান করেছিলো, কিন্তু কমলের গান শুনে মনে হ'লো পাষাণী অহল্যাও এ শুনলে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে দানবী হয়ে উঠতো। আপাতত চারিদিকের পাহাড়-গুলো নাপ্রাণ পেয়ে ফ্র্যাংকেষ্টাইনে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

বালি

শ্রীমতী বাণী রায়

বালি, বালি, বালি !
ধূ ধূ করে খালি।
সাহারার মরুভূমি নয়,
পেওনাতো ভয়,
আরবের মরুপথ নয়।
সহরের শেষে জমা রাশি রাশি বালি,
হতেছে তৈরী বাড়ী গুটি পাঁচ ছয়।
তুমি পেওনাতো ভয়,
অক্ষয়-অব্যয় নয়, কিছু নয়।
গলে যায় জল হয়ে বর্ষণ লেগে,
ভেঙ্গে পড়ে বালিবাঁধ বাতাসের বেগে।
নির্ম্মাণ যাহা হয়, সে-ও স্থায়ী নয়—
বোমাতে হয়তো যাবে—পেওনাতো ভয়।

শুধু শুধু বালি, তবু ভয় পাও ?
পিপাসায় যায় প্রাণ শুধু বালি দেখে ?
মরুতে চলোনা, তবু মরীচিকা ছবি
বারে বারে চোখে আঁকো ভুল করে, কবি !

অতীত প্রহরে চলো—যবনিকা তুলি
দেখাই বালির ঘড়ি, ধীরে ধীরে ঝরে
সোনার রেণুর মত বালুকার কণা,
তারো সাথে ঝরে যায় সময়ের ফুল।
বন্ধু, বন্ধু, কোরোনাতো ভুল।
আমারো দিবস ঝরে বালুকার মত,
চেয়ে দেখ ছিদ্রেতে আর বাকী কত।
তোমার আমার দেখা বালির মতন
ঝরে যায় ক্ষণে ক্ষণে, ঘনায় মরণ।
অভ্রের চিকিমিকি তবু রবিকরে,—
তবু তো নিশীথ রাতে কালছায়া ম্লান !

বালির রয়েছে রূপ, দেখি তাই আমি,
—এত ভাল লাগে যার সংক্ষেপ জীবন !
জানি, জানি অন্তরীক্ষে ঝরে বালুঘড়ি,
ঝরে যায় শুভক্ষণ ফুলের মতন।

আমরা দুজনে বেঁধেছি ঘর
এই বালির ভিত্তি 'পর,
ঘর করে টল্‌মল্—
দুয়ার রুদ্ধ, অন্ধকারেতে খুঁজে মরি অর্গল।
উত্তর হাওয়া হানিছে আঘাত,
বালি হোল চঞ্চল,
ঘর করে টল্‌মল্।
যদিও বালির ঘর,
তবুও দেহলী 'পর
জ্বলিবে আমার বিনিদ্র রাতে মনের কামনাগুলি,
অর্গল তবু পাইনা খুঁজিয়া—যায় না দুয়ার খুলি।
নূতন কিছুই নয়,
পেয়োনা, পেয়োনা ভয় !
সহস্র যুগে সহস্র প্রাণী বেঁধেছে বালির ঘর,—
স্থায়ী নহে কিছু, তবু কত গৃহ রচিত বালির 'পর !
তুমি পেয়োনাতো ভয়,
এমনি করেছি বহুদিন মোরা,
এওতো নূতন নয়।
স্বপ্নেতে দেখি বিরাট প্রাসাদ অভ্রেতে তুলি শির ;
সিংহদুয়ার, বাতায়ন সারি, সোনার মীনার তার ;
প্রবেশ করিছ সিংহদুয়ারে– আমিও চলেছি সাথে,
সহসা দোঁহার মাথার উপরে গৃহ হোল চুরমার !
যুগ যুগ ধরি এইতো নিয়ম,
এইতো করেছি হায়,
বালির ভিত্তি, তাইতো বন্ধু,
প্রাসাদ খসিয়া যায়।

আলমোরার চিঠি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভাই—

কাল সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। তার উপর রাত বারোটায় উদয়শংকরের নৃত্যপরিকল্পনা দেখে ঐ বিপর্যয় লম্বা কবিতা লিখে ফেলা—সরাসর। তবে কি জানো ? সাধারণ জীবনে—দিনানুদৈনিক অনুভবহীন লেনদেনের জের টেনে চলতে চলতে—আমাদের মধ্যে ভাবের আবেগ খোরাক পায় না। তাই যখন উচ্ছ্বাস একটু আধটু করতে পারি মন ভ'রে ওঠে। আর উদয়শংকরকে নিয়েও যদি উচ্ছ্বাস একটু না করব তবে করব কাকে নিয়ে ? তোমার কাছে অনেকে আমাকে উচ্ছ্বাসী ব'লে বাঁকা হাসে তাই বললাম একথা। হাসে—হাসুক : they won't have the last laugh, জপি মনে মনে অকুতোভয়ে। তবে উদয়শংকর সম্বন্ধে ও কবিতাটি তোমার অন্তত উচ্ছ্বাস মনে হবে না জানি। তাই ওটি লিখেই পাঠালাম তোমাকে। একজন অক্সফোর্ড প্রত্যাগতা গুজরাতি তরুণী কবি আমাকে একবার লিখেছিলেন বড় সুন্দর কথা : যে, পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তো সবাই গীতি-কবি—চল্লিশ পেরিয়ে যার গীতিকাব্যোচ্ছ্বাস বেঁচে থাকে তাকেই বলব খাঁটি। কাজেই উচ্ছ্বাসের জন্যে লজ্জা পাওয়ার দরকার দেখি না। (আশা করি একে বলবে না—protesting too much ?)

কিন্তু এবার চিঠিতে ফিরে আসি। আজকাল আর চিঠি লিখতে পারি না। মন বদ্‌লে গেছে। চিঠির সরসতার ভারা বয় যে আনন্দের স্বতঃস্ফূর্তি দুনিয়ার ধূসর চেহারা দেখে দেখে সে আনন্দও যে গেছে ধূসর হয়ে। না ভাই, আমি চিরতরুণদের দলে নই—কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে বিশেষ ফল হয় এও মনে করি না। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে আমার আক্ষেপ হয় না এতটুকুও। জীবনের সব শ্রেষ্ঠদানই পেকে ওঠে বয়সের পাক ধরার সঙ্গে। "ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা"—এ কবিতাটি আমার চিত্তাকাশে কোনোদিনই সিউডো সবুজতার সাতরঙা রামধনু রাঙিয়ে তোলে নি। আমি মেনে নিয়েছি—জীবনের ধর্মই এই যে এ যখন আসে তখন ও চ'লে যায়। তাছাড়া চিরতারুণ্য আমার কাছে কোনোদিনই লোভনীয় মনে হয় নি। স্বস্থানে ও সুন্দর জিনিষ—কিন্তু তারুণ্য নিয়ে মাতামাতি দেখলে আমার হাসি পায় সত্যিই। দোলনায় শিশু হাত পা ছোড়ে। চমৎকার দেখায়। তুমি যখন ছুড়তে বছর চল্লিশ আগে তখন তোমাকেও যে অতি সুন্দর দেখাত এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তাই ব'লে এখন ফের চেষ্টা করলেও হবে কি সেই হারানো শিশু-অঙ্গোৎক্ষেপের সৌন্দর্যের পুনঃপ্রবর্তন ? না, তরুণ বয়সে যে ভাবে চিঠি লিখতাম, কবিতা লিখতাম, নাটক নভেল লিখতাম তে হি নো দিবসা গতাঃ। যখনকার যা তখনকার তা। এখন চাই আমি এখনকার মনের ছবি ফোটাতে আমার এখনকার রঙে ঢঙে গমকে ঠমকে। ব্যস, আর কিছু না। এ চিঠির ভূমিকা এইখানেই শেষ হোক।

উদয়শংকর কী সুন্দর লোক যে ! এমন নম্র—সত্যিকার নম্র ! কালিদাসের "পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা" চরণটি মনে পড়ে। খাবার টেবিলে ব'সে ওর কী ফুরতি ! এপাশে সিম্‌কি ওপাশে অমলা—উদয়শংকর ব'লে চলেছে ওর জীবন-কাহিনী। উপভোগ্য বটেই তো। ও এক সময়ে ছিল বাজিকর —জানতে ? কক্ষনো জানতে না আমি বাজি রেখে বলতে পারি। সিম্‌কিও বড় চমৎকার মেয়ে। যখন তখন উদয় হয় আমার ঘরে সাড়ি প'রে। কী মিষ্টি যে ওর কথা। জানতে চায় গুরুদেবের কথা। গানও খুব ভালোবাসে। কাজেই বেশ ব'নে গেল, বুঝলে না ? অমলা ওর সদ্যোজাত বালগোপালটি নিয়ে আহ্লাদে আটাশখানা। উদয়শংকর একদিন একটা নাম দিল—বাকায়দা, ওদের নৃত্যমঞ্চে। তখন অমলা আমার পাশে ব'সে। বললাম : "কী অমলা, খুব গৌরব হচ্ছে, না ? যাকে কেউ বাঁধতে পারল না

তাকে—"। ও সলজ্জ হেসে বলল: "সত্যি দিলীপদা এ আমি ভাবতেও পারি নি।" তা উদয়শংকরের মতন বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভার ঘরণী—গর্ব হবে না-ই বা কেন শুনি? অমলা আমার 'পরে ভারি প্রসন্ন: "শুধু আপনিই আমাকে যোগ দিতে বলেছিলেন আলমোরায় নবসৃষ্টির কাজে—তাই আপনার উৎসাহের জন্যে আমি আজও ঋণী।" তখন ওকে অনেকেই মানা করেছিল আলমোরা আসতে .তাই ও আমার নগণ্য উৎসাহদানকেও গণ্য করেছে। মানুষ ভালো কাজে বেশি উৎসাহ পায় না এ একটা শোকাবহ ব্যাপার বই কি।

উদয়ের ভাই রাজেন্দ্রশংকরের স্ত্রী লক্ষ্মী তামিল মেয়ে। মুখখানি বেশ টুলটুলে। সপ্তদশী। নাচে বড় সুন্দর—সেটা না হয় বোঝা যায়। কিন্তু বাংলা গান এমন গায় কী ক'রে? আমার কাছে কয়েকটি গান এমন তুলে নিল—ছ'কে নেওয়া যাকে বলে। মাদ্রাজি মেয়েদের আশ্চর্য সঙ্গীত-প্রতিভা। বললাম লক্ষ্মীকে যে, তোমাকে দেখলে শুভলক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে।

"শুভলক্ষ্মী! আপনার কাছে কটা গান শিখেছে সে মন্টুদা!" (লক্ষ্মী পরিপাটি বাংলা বলে—রাজেন্দ্রশংকরের হার মানতে হ'ল—সে কি এমন তামিল বলতে পারে ভেবেছ? পাগল!)

"পাঁচটা হিন্দি, দুটো বাংলা। আহা কী গায়!"

"অপূর্ব গায় ও!" শুভলক্ষ্মী এদের কাছে যেন শেক্সপীয়র কণ্ঠসঙ্গীতে: 'Others abide our question. Thou art free'—বলেছিলেন না ম্যাথিউ আর্নল্ড?

সত্যি মাদ্রাজীদের মধ্যে গানের অনুরাগ তথা প্রতিভা আশ্চর্য। যদি কেবল ওরা উত্তর ভারতের সাঙ্গীতিক ঢঙে গাইত কর্ণাটি সঙ্গীত! কথাটা খানিকটা শরৎচন্দ্রের মতন হ'ল না! আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে অচ্ছন বাইয়ের কাছে চমৎকার চমৎকার হিন্দি গান শিখছি, তখন খবর পেয়ে তিনি লিখেছিলেন (মনে আছে?)—"আহা মন্টু বড় ভালো করছ শিখে। শিখবেই তো! কেবল ঐ গানগুলো যদি বাংলা হ'ত। কারণ কী-ই বা হবে হিন্দি গান শিখে বলো?" অ্যান্টি-ক্লাইমাক্সের এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত কি কল্পনা করা যায়?

যাই হোক যেজন্যে একথা তুললাম সেটা এই যে লক্ষ্মী শিখলে সত্যিই সুগায়িকা হবে। যেমন মিষ্ট কণ্ঠ তেম্‌নি দরদ ভরা মিড় তান! ওকে যদি কাছে পেতাম দুচারমাস—যেমন ৺হাসিকে পেয়েছিলাম। অবশ্য ৺হাসির মতন হ'ত এতটা বললে সেটা হবে 'দুঃসাহস'—৺হাসির কণ্ঠ, প্রতিভা ও নিষ্ঠা এ তিনের যোগাযোগ সংসারে অতি বিরল—তবে খুব বড় গায়িকা ও হ'তে পারে এ আমি অকুতোভয়েই বলব। দুঃখ এই একথা উদয়ও বলছিল—ভালো গান শেখাবার লোক পাওয়া ভার আলমোরাতে। নিরুপায়। দেখা যাক। ও তো বললে মাদ্রাজ যখন ওর পিতৃগৃহ তখন আমাদের আশ্রমে এসে থাকবে একবার কিছুদিন। ভাবতেও ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সালে আমাকে একবার বলেছিলেন (৺হাসির কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে) "ভালো কণ্ঠ ক—ত কম মেলে দিলীপ, নয়?" তাঁর সেই ক—ত'র মিড়ের ঝংকার আজও কানে বাজে। সত্যি ভাই,

গান গায় তো ভক্তজনাই—সুর তাল রাগ সবই সেরা,
মন তবু হায় বলে: "উঁহুঃ, নয়ক হেথায় গানের ডেরা।
কণ্ঠ যখন চতুর্দোলা—তখনই সঙ্গীতের বঁধু
হ'ন সুখাসীন সিংহাসনে ঝরিয়ে প্রাণের রূপমধু।

কিন্তু এখুনি লক্ষ্মী আসবে ফের গান শিখতে, তাই এ চিঠির নিউ পর্বে প্রবেশ করা দরকার। আরো এই জন্যে যে এ রকম চৈঠিক মেজাজ আমার আজকাল হয় না বড় একটা—অ-তরুণ তো আমি মনে প্রাণে—এবং অননুতপ্ত অতরুণ এ-ও মানতেই হবে।

বিকেলে গেলাম বশী সেনের বাড়ি। বশী সেনের নাম কে না জানে? নামজাদা বৈজ্ঞানিক। চমৎকার বাগানওয়ালা বাড়ি। গভর্ণমেন্ট অনেক টাকার বরদান দিয়েছেন! ল্যাবরেটরিতে অণুবীণে দেখালেন protoplasm—যার নামই শুনে এসেছি এযাবৎ। তরল ঢেউয়ের মধ্যে আলোর ফুটকি ফুটকি ফুটকি—ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কী কাণ্ড! প্রতি পাতায় শিরায় শিরায় এই রকম সব প্রাণবন্ত অণুরা নাহক রেস খেলে বেড়াচ্ছে। আর কী চঞ্চল তারা!

এই এখানে ঐ সেখানে—কখনো বা দিচ্ছে পাক।
নেই বৈঠকখানা—শুধুই পান্থ চপল লাখে লাখ।

অনেক কথা হ'ল ভদ্রলোকের সঙ্গে। ঠিক হ'ল কৃষ্ণপ্রেমের যোগাশ্রম থেকে ১৫ই এপ্রিল নাগাদ ফিরে দুএকদিন ওঁর সুরম্য নিলয়ে অধিষ্ঠান করব—নৈলে উনি কিছুতে ছাড়িবেন না। আতিথেয়তায় ইনি আবুহোসেনের দোসর—মানে আবুহোসেন at his best. রবীন্দ্রনাথ এঁরই ওখানে থাকতেন—অতিথিদের জন্যে এঁর গৃহদ্বার খোলা। ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স, কিন্তু কী সরল যে মানুষটি—শিশুর মত। শুধু সরল না—প্রেমিক। নাটকীয় ভঙ্গিতে ওঁর মুখের ভাষার একটু নমুনা দিলামই বা। বললেন আমাকে ওঁর ঠাকুর ঘরে সে কত যে কথা অনাদি! 'মশয়' কথাটি ইনি প্রায়ই বলেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: 'আমাদের ওখানে একদিন থাকবেন তো মশয়—অনেক কথা আছে—একান্তে।'

একদিন চায়ে ডাকলেন উদয়কে, আমাকে আর রাজুকে। ওঁর স্ত্রী Gertrude Emerson Sen ভারতীয় "এশিয়া" পত্রিকার সম্পাদিকা। বড় অমায়িক মানুষটি। সবাই এঁকে বৌদি বলে। মালপো খাওয়ালেন প্রচুর। কতদিন খাইনি এ বৈষ্ণব সাত্ত্বিক মিষ্টান্ন। ধমনীতে অদ্বৈত গোস্বামীর 'নীল রক্ত' উচ্ছল হয়ে উঠল। বললেন ওঁদের ওখানে যখন থাকব অজস্র মালপো খাওয়াবেন। ভাবো—এ চিনির দুর্দিনেও! ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় না?

চায়ের পরে বশী সেন মহাশয় নিয়ে গেলেন ওঁর ঠাকুর ঘরে। পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ স্বামী, রাখাল মহারাজ প্রভৃতির ছবি। চমৎকার ঘরটি। যে ঘরে প্রার্থনা হয় তার আবহই যায় বদলে। এমন সুন্দর বাড়িটি! সবই সুন্দর। কিন্তু এ আবহ আর কোন ঘরে মেলে না। 'তীর্থ' কথাটায় আমরা আজকাল নাসিকা কুঞ্চিত করি। 'স্থান মাহাত্ম্য' না কি কুসংস্কার! হা অদৃষ্ট। রঙকানাদের রায় হ'ল প্রামাণ্য ইন্দ্রধনু সম্বন্ধে! ভাব-ভক্তির চর্চা যারা কস্মিন কালেও করল না—শুধু তারুণ্যের হুহুঙ্কারে তারা মন্দির বিগ্রহ পূজা অর্চনা সব কিছুরই সম্বন্ধে রায় দেবে আর আমাদের শুনে যেতে হবে? তবে দুঃখ আমাদের চেয়ে তাদেরই বেশি, নয় কি ভাই? যে পেল না অথচ জানতেও পারল না কী পাবার আছে—শুধু গদ্যছন্দ আর তারুণ্যের ফাঁপা ধুমধড়াক্কা নিয়ে রইল মেতে—তাদের হাসাহাসিতে আর কী আসে যায় বলো? বড় অনুভব বড় সত্যকে তারা ছোট করবেই বা কী ক'রে? হাসুক না। পরমহংসদেবের কথা মনে পড়ে: "গি—মদ খায়? খাক না খাক না কদিন খাবে?" সংসারের বাজে ফক্কিকারি নিয়ে ডামাডোল?—কদিন করবে? দুঃখই ফিরিয়ে আনবে অমৃতের পথে—নাকে দড়ি দিয়ে। কৃষ্ণপ্রেমের উপনিষদ উদ্ধৃতি মনে পড়ে:

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।

চর্ম দিয়ে আকাশ ঘেরা—এ অসাধ্যসাধন যেদিন হবে
সেইদিনই ভাই দেবদেবকে না জেনেও ঘুচবে দুঃখ ভবে।

কিন্তু এবার বশী সেন মানুষটির কথা বলি—বৈজ্ঞানিক মানুষটির নয়—আসল মানুষটি যে এই দেবদেবকে জানতে চেয়েছে তার শুধু জীবনের মধ্যে দিয়ে নয় কাজ কর্ম ধ্যান ধারণা সব কিছুরই মধ্যে দিয়ে। এই মানুষটি অনির্বচনীয়—তবু বচন সার্থক হয় এই অনির্বচনীয়েরই নাগাল পেতে চেষ্টা করে।

আমাকে তো নিয়ে গেলেন ওর ধূপসুরভিত সুন্দর ঠাকুরঘরটিতে। তারপর পাশাপাশি দুটি আসনে ব'সে সে কত কথা!—রাখাল মহারাজের তামাক সাজতেন, গিরিশ ঘোষের মৃত্যু ওঁর কোলে, শ্রীমতী শারদামণি দেবীর স্নেহ পাওয়া—কত কী। বড় ভালো লাগল সাধুসঙ্গ নিয়ে বয়স্ক মানুষের এধরণের সরল উচ্ছ্বাস দেখে। মানুষ উচ্ছ্বাস করে সচরাচর কী নিয়ে বলো তো? টাকাকড়ি ছেলেমেয়ে, যশমান, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, লোকলস্কর এই সবই তো। বড় বড় সাধুর চরণপ্রসাদ পেয়েছি এ নিয়ে গৌরব করে কজন এ নাস্তিক্যের যুগে? যাহোক ওঁর কথার ঢং কিরকম শোনো।

"মশয়! ভগবান পাওয়া কি সোজা কথা? তবু পাওয়া যায়—আর সে কেবল ঐ সাধুদেরই কৃপায়। শ্রীঅরবিন্দকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবেন। জানাবেন তো? ভুলবেন না যেন ভুলেও। আমি জানি উনি যা ইচ্ছে করতে পারেন তা পাঁচজনে মানুক বা না মানুক। ইচ্ছে করলে মহাত্মারা কী না করতে পারেন মশয়?—কী? আমি সায়েন্স করি? বাঃ—সায়েন্স করি ব'লে কি সাধুমহাত্মায় বিশ্বাস থাকবে না? সেই সাঁওতালদের কথা জানেন তো মশয়। তাদের ধ'রে

ধ'রে খৃষ্টান করল বেটা পাদ্রিরা। ভাবল কী কাজই না করেছি! অষ্টরম্ভা! ওমা, একদিন দেখে কি: তারা কালী-পুজো করছে। খৃষ্টানি হুঙ্কার: একী কাণ্ড! ওরা তো অবাক! —'সায়েব! বলিস কি তুই? খৃষ্টান হয়েছি ব'লে কি ধম্ম ছাড়ব?'—হা হা হা হা। আমারও ঐ কথা। না (গম্ভীর হ'য়ে) আমার যেটুকু হয়েছে সেটুকু শুধু ঐ দুচারজন সাধুপুরুষের ও মৃত সাফ ক'রে। রাখাল মহারাজ, গিরিশ বাবু, মা ঠাকরুন—এঁরাই না কৃপা ক'রে আমার পথচলায় ধরেছেন আলো। কৃপা কৃপা কৃপা! ও ছাড়া কি আর তর্‌তে পারে কেউ মশয়? নাস্তিক বেটারা বলে কি না কৃপা নেই। আরে, সাক্ষাৎ পেয়েছি, দেখেছি, চেখেছি তবু কান দেব ওদের কথায়? আর একবার তো নয়, বার বার। অবসাদ মনঃকষ্ট অন্ধকার চারদিকে। রাখাল মহারাজের পা টিপলাম। ও মা! কী ফুরতি সে! কী বললেন? বিশ্বাস? আমার বিশ্বাস! ছ্যা। বিশ্বেস ফিশ্বেসে বশী শশ্মা নেই। প্রত্যক্ষ মশয় প্রত্যক্ষ। সায়েন্সের মতনই চাক্ষুষ। স্বচক্ষে দেখেছি বার বার সাধুসঙ্গের ফল। * * * শ্রীঅরবিন্দের কৃপা পাওয়া কি চারটি খানি কথা মশয়? আমি জানি উনি সব পারেন স—ব। ভগবান কথা কন কার মধ্যে দিয়ে বলুন তো? সাধু মহাত্মার—আর কারুর মধ্যে দিয়ে নয় জানবেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবেন শ্রীঅরবিন্দকে। পণ্ডিচেরি আমি যাবই যাব। —কেবল দেখা পাব তো তাঁর?—কী? তিনি কারুর সঙ্গে কথা কন না! আহা হা, কথা কইতে কে চাইছে তাঁর সঙ্গে? সাধু মহাত্মার সঙ্গে কথা ক'য়ে হবেই বা কি। আমি চাই শুধু তাঁর দর্শন—আর কিছু না। কী? আশীর্বাদ? আরে তাও কি আবার চাইতে হয় না কি মশয়? বাঁদরের কাছে কি দাঁতখিঁচুনি চাইতে হয়েছে কারুর? তার কাছে যেতে না যেতেই ওটা মেলে। ঠিক তেমনি সাধুপুরুষদের কাছে যেতে না যেতে মেলে আশীর্বাদ। মিলবেই। 'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ' মশয়! এও বুঝলেন না। গীতাটি পড়তে হয় বারবার। মুখস্থ করা চাই। কী—হাসছেন? মুখে গীতার গুণগান? ভূতের মুখে রাম নাম? আরে মশয় ভগবানের লীলা বিচিত্র। তাই আমাকে দিয়ে তিনি এক নতুন খেল খেললেন—'দেখ্‌রে বেটারা বৈজ্ঞানিক হ'য়েও গীতার কথা কয়'—হা হা হা হা। তাইতো কৃপা মেনেও প্রার্থনা করি। এই ঠাকুর ঘরে প্রায়ই বলি ঠাকুরকে 'দেখ ঠাকুর, আমি হয়ত যখন তখন যা তা খেয়ে বসব। স্বভাব—জানোই তো। যতক্ষণ বাসনা আছে এ ও তা সাত পাঁচ তো চাইবই। কিন্তু তোমাকে বলা রইল—খবর্দার, যা যা চাইব সবই যেন দিয়ে বোসো না। যা পাওয়া ভালো নয় কখনো দিও না ঠাকুর। তুমি জানো কী ভালো—আমি তো জানি না। তাই দ-য়ে মজিও না অবস্ত দিয়ে। * * আরে শুনুন মশয়, দুটো প্রাণের কথা কই। আমার এখানে দু একদিন থাকতেই হবে—কেবল উদয়শংকরের ওখানে থেকে লম্বা দেবেন সেটি হচ্ছে না। আমি আলমোরার রাজা জানেন তো? বাস টাস দেব সব ভেস্তে, যাবেন কী ক'রে? হা হা হা হা। না না সত্যি, অনেক কথা আছে, অনে—ক। কী-? সায়েন্স করি? হ্যাঁ করি। ঘাটি দিনকতক। কারণ জানি ভগবান্ ফস্কাতে পারেন না—সে অসম্ভব। আরে ফস্কালেই হ'ল? বিশ্বাস এসে গেছে যে মশয়। একেবারে পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস—ঠাকুরেরই কথা। আহা কি কথাই বলতেন ঠাকুর। তিনি না জন্মালে কটা শালার বিশ্বাস হ'ত বলুন তো আজকের দিনে? তবু অন্ধ বুদ্ধিমন্ত বেটারা বলে কি সাধু মহাত্মাকে পুজো নরপুজো। আর নরপুজো ছাড়া কি পথ আছে দাদা! গিরিশ ঘোষ বলতেন মনে আছে তো—ভবপারাবারে যিনি তারণ করেন তাঁর ও মৃত কি আর ও মৃত মনে হয় সার্? না মশয় আমি জানি ওঁদের কৃপা বৈ পথ নেই। তাই তো দিব্যি সায়েন্স নিয়ে আছি ভগবানকে ভুলে। আর মশয় ভগবানকে না ভুললে কি কর্ম হয় কখনো? সে পারেন এক সাধু মহাত্মারা। আমরা কর্ম করি ভগবান্ করছেন ভেবে নয়—আমরা করছি এই ভেবে। ভাবলামই বা। ঠিক সময়ে তিনি বুঝিয়ে দেবেন আমরা অকর্তা। পরেও করবেন—নইলে তাঁকে পারের পারী বলেছে কেন? তাছাড়া কাজটা তো তাঁরই—তিনি জানেনও সেকথা। তবে আর দুঃখ কি! না মশয় দুঃখু টুকু আমার কিছু নেই। ভগবান লাভ যখন হবেই জানি তখন দুঃখর মানে কী বলুন? পরমানন্দে আছি মশয়—পরমানন্দে আছি।"

এপ্রিল, ১৯৪৩

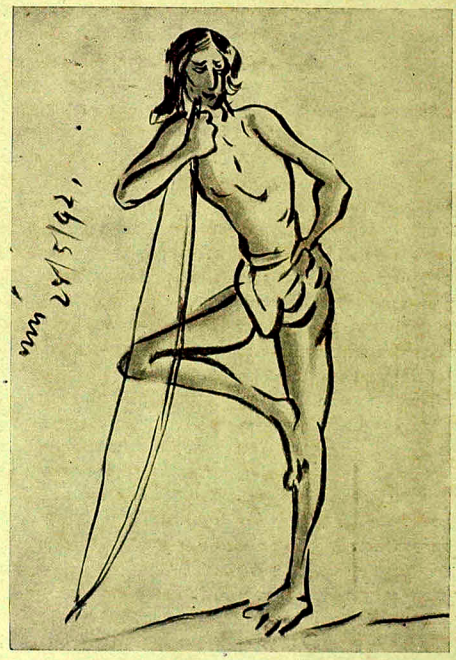

শিল্পী—নন্দলাল বসু

বর্ষামঙ্গল

শিল্পী—রাণী চন্দ

জাগো দেবী শাশ্বতী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জীবনের মাঝে যারা নিয়ে আসে
আলোর অজস্রতা,
দীপালোকে তা'রে চিনাবে কেমনে ?
তৃষারের শুভ্রতা
তুলির পরশে বাড়ে না কখনো
আপনি যে মহিয়সী
তারি উদ্দেশে শত প্রশস্তি
ওঠে সদা উচ্ছসি'।

তেজে গৌরবে নারী-মাহাত্ম্যে
যাহার জীবন ব্রত
সার্থক হ'ল মহামহিমায়
শির্ষ সমুন্নত
তার মর্য্যাদা কতটুকু বাড়ে
আমাদের স্তুতিগানে
কীর্ত্তি অমর নিরবধিকাল
আপনার সম্মানে।

মহিয়সী নারী, মহতী তোমার
পূত চরিত্র গাথা,
স্বনামধন্যা বরণীয়া বলি'
চরণে নোয়াই মাথা।
কবির কাব্যে অক্ষয়া তুমি
মনে স্মৃতি মন্দির
সেথায় কবির বাণী মন্ত্রের
মূর্চ্ছনা গম্ভীর।

যুগযুগান্ত অসীমে মিলায়—
তবু জ্বলে অবিরাম
স্মরণ-চিতার শুদ্ধ অনল
শিখা তার অভিরাম।

তেমনি গঙ্গা চিরপ্রবাহিনী
উচ্ছল দুই কুল
পূজার বেদীতে আজো অমলিন
তোমার পূজার ফুল।

কল্যাণ করে জ্বালাও আবার
আরতির দীপমালা,
তোমার চিত্ত-ধূপের দহন
মধুর গন্ধ ঢালা ;
অনলশুদ্ধা, অপাপ বিদ্ধা
জননী, পুণ্যবতী
জাগো বাঙলার অন্তরাতলে
জাগো দেবী শাশ্বতী।

শত বন্ধনে বন্দী যে মোরা
বুকে নিদারুণ জ্বালা
চির পূজারিণী নূতন করিয়া
সাজাও পূজার ডালা ;
নারীর তীর্থপথের আঁধার
দু'হাতে সরায়ে ধীরে
নির্ম্মাল্যের প্রসাদ বিলাতে
এস মা জননী ফিরে।

বেদনসিন্ধু উথলি উঠিছে
উত্তাল কলরোল
মা-হারা কাঁদিছে তুমি না জাগিলে
কে দিবে তাদের কোল ?
জাগো জাগো দেবী, সাথে নিয়ে এস
নব প্রভাতের আশা
বাজাও বাজাও মঙ্গল শাঁক
সকল বিঘ্ন-নাশা।

প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভোর হয়ে গেছে। পথ ঘাটে লোক চলতে আরম্ভ করেছে। অন্ধ চারণী পথে গেয়ে চলেছে "সেই ছাত্র নিপীড়ন, রাখিও স্মরণ, রেখো মনে জাপানীর সে মূরতি ভীষণ রে।" গানের সুর বড়ই করুণাদায়ক কিন্তু কি গাইছে তা মোটেই বুঝিনি। সকালে উঠেই গানটার অর্থ জেনে নিলাম। আমি ভেবেছিলাম জাপানীদের রিরুদ্ধেই গানটা তৈরী করা হয়েছিল শেষটায় বুঝলাম তা নয় গানটার অর্থ হবে "সেই ছাত্র নিপীড়ন রাখিও স্মরণ, রেখো মনে পুঁজিবাদীর সে মূরতি ভীষণ রে।" চীন দেশে অত্যাচার কম হয়নি। চীনের উন্নতিকামী ছাত্রদের প্রতি ঘরের লোক এবং বাইরের লোক সবাই অত্যাচার করেছে। আরও কত রকমে অত্যাচার করা হয়েছে তা কে জানে। যখনই যে মহাপুরুষ অথবা মহাপুরুষেরা দেশের উন্নতি করতে চেষ্টা করেছেন তখনই তাদের প্রতি বেজায় অত্যাচার হয়েছে। বিনা অত্যাচারে কারো প্রাণে চেতনা আসেনি, চেতনা আসতেও পারে না। এসব কথা সবাই জানে কিন্তু অত্যাচার সহ্য করার মত মন কার কতদিন থাকে? যার মন যত কঠিন এবং যত উন্নত সে তত অধিকদিন বর্ব্বরদের অত্যাচারের সামনে দাড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। রাণা প্রতাপ তার একটি দৃষ্টান্ত। তবে চীনের ছাত্র এবং ছাত্রীরা কোন্ স্তরের বলতে পারিনা তারা অত্যাচার সহ্য করে অত্যাচারীর সংগে যেমন করে লড়েছে, পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত অতি কম। এরূপ চিন্তা করেই বোধহয় সে দিনটা কেটে যেত, কিন্তু তাতে একটা বেশ বড় রকমের বাধা পড়ল। আমার সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য একজন ডাক্তার আসলেন। তার বাড়ি ঘোড়দৌর মাঠের কাছে। তিনি এসেই আমাকে বেলা তিনটার সময় খাবার খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আড়াইটার সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখি অন্যান্য কয়েকজন লোকও তথায় বসে আছেন। তার মাঝে একজন আমার পরিচিত। তিনি হলেন মিঃ ওয়াং। মিঃ ওয়াং বেশি কথা বল্‌লেন না শুধু অপরের কথা শুনে যেতেই লাগ্‌লেন। খাবার শেষ হয়ে যাবার পর ডাক্তারের স্ত্রী আমার সংগে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথায় এমন কিছু ছিলনা যা এগানে বল্‌লে কারো কোন উপকার হয়। মিঃ ওয়াং শুধু আমাকে বল্‌লেন সিন মিন সুয়ে কোন দলের লোক যদি জানতে চান তবে এই পর্যন্ত জেনে রাখুন, যারা কমিউনিজম কায়েম করতে তাদের যথা সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে তারাই সিন মিন সুয়ে। এদের আপনি খুঁজে পাবেন না। তারা কখনও সভা করে না, তারা কখনও কয়েকজন একত্রিত হয় না। তারা চীনের সর্বত্র বিরাজ করছে। তাদের সংগে জাপানের ব্লেক ড্রেগনের তুলনা হতে পারে, এবং ব্লেকড্রেগনের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে তবে আছে সিন মিন সুয়ে। সিন মিন সুয়ে হল চীনদেশের কমিউনিষ্ট। এর বেশি আপনার আর কিছুই জানবার আর রইল না। তাদের খুঁজতে আপনি চেষ্টা করবেন না, খুঁজলে পাবেনও না। কথাটা শুনে আমার মুখ বন্ধসিয়ে উঠল। আমি সিগারেটে বেশ দম দিতে লাগলাম আর আমার দৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করতে লাগলাম। মুখ লুকাবার চেষ্টা করতে লাগলাম সত্য কথা, কিন্তু কতক্ষণ মুখ লুকিয়ে থাকা চলে! শেষটায় যখন উঠতে যাচ্ছি তখন মিঃ ওয়াং বললেন আজই মিঃ চেন আপনার কাগজে সই করে দিবেন, কাল সকালে তাই নিয়ে আপনি আমেরিকার কনসাল অপিসে যাবেন। আমি নীরবে মাথা নত করে হোটেলে চলে আসলাম এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমেরিকার কনসালের বাড়িতে সকাল বেলাই রওয়ানা হলাম, পথে দেখা হল জনৈক পরিচিত সিংহলীর সংগে। সিংহলী লোকটি আমার সংগে কথা না বলে আমার পেছন নিয়েছিল; আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং তাকে বেশ স্পষ্ট করে

বললাম "আমেরিকার কনসাল আমাকে আজ ভিসা দেবেন, আপনি সত্বর আপনার উর্ধতন কর্মচারীদের সংবাদ দেন যাতে আমি ভিসা না পাই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুন্জ দেখতে না পারি। বৃটিশ কনসালের কাছে যাবেন তবেই কাজ হাসিল হবে। লোকটা আমাকে আমেরিকার কনসালের বাড়ীর দরজার সামনে রেখে বোধহয় বৃটিশ কনসালের বাড়িতেই গিয়েছিল। আমি ভিসা নিয়ে আর কোথাও দাঁড়ালাম না একদম চলে আসলাম বৃটিশ কনসালের বাড়িতে। কনসাল আমাকে জানতেন এবং আমার উপস্থিত হওয়ামাত্রই ডেকে পাঠালেন। কথা প্রসংগে বললেন আপনি দয়া করে দেড়শত ডলার পেয়েছেন বলে এক খানা রসিদ দিন আমি আপনাকে পঁচিশ ডলার দিচ্ছি। আমি তৎক্ষণাৎ দেড়শত ডলার পেয়েছি বলে এক খানা রসিদ দিলাম এবং মাত্র পঁচিশ ডলার পেলাম। এই টাকাটা পাবার একমাত্র কারণ হল, আমার সম্বন্ধে অনেকেই নানা রকমের রিপোর্ট দিয়েছিল। প্রত্যেকেই সেজন্য কিছু পেয়েছিল, আমিইবা তা হতে বাদ যাই কেন এই ভেবে কনসাল অন্যান্য রিপোর্টারদের রসিদ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু আমার রসিদ খানাই রেখে দিলেন। বুঝলাম পর্যটকের দেওয়া টাকার রসিদের মূল্য অন্যান্য সকলের রসিদের মূল্য হতে বেশি।

তখনকার দিনেরু সাংহাই এক আজব শহর ছিল। একটা মরা গরুর চারদিকে শকুনির দল যেমন করে ঘিরে দাঁড়ায় একটা নবাগত ইণ্ডিয়ানের চারিদিকেও ঠিক তেমনি শকুনীদের মতই এক রকম জীব এসে ঘিরে দাঁড়াত। এসব শকুনীদের নানা দেশের কনসাল পোষণ করেন!

আমার ইচ্ছা ছিল ফিলিপাইন দ্বীপের রাষ্ট্রকেন্দ্র মেনিলা হতে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ্ দেখে সিংগাপুর ফিরে আসি, তাই সাংহাই হতেই সুরবায়ার ভিসা নিবার চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয়েছিল। একদিন সেই মতলব যাতে পূর্ণ হয় সেজন্য ডাচ কনসালের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ডাচরা বড়ই মিষ্টভাষী এবং মিচকী শয়তান। যদিও ডাচ কনসাল আমার সংগে হেসেই কথা বললেন তবুও ভিসা দিবার বেলা তার কলম আর উঠলনা। কনসালের ঘর হতে বার হয়ে দেখি আমার জন্য একজন ভারতীয় অপেক্ষা করছেন। তাকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হলাম। আমি ভারতীয়টির দিকে থুথু নিক্ষেপ করে সিনেমা দেখবার জন্য সিনেমা ঘরে চলে গেলাম। সিনেমা ঘরে কোন ভারতবাসী নাই দেখে আনন্দিতই হয়েছিলাম। বিদেশের ভারতবাসী যারা সত্যিকারের ভারতীয় পর্যটক তাদের পেছন নেয় এবং নানারূপ অন্যায় কাজের সাহায্যে পর্যটকের কাজে বাধা প্রদান করে। এই কুনিয়মটি একদিন নিশ্চয়ই পৃথিবী হতে লোপ হবে তবে সে সময় আসতে আরও বহু বৎসরের দরকার।

গুপ্ত পুলিশের কাজ করতে কেউ কারোকে বাধ্য করেনা, তবে কেন বিদেশের ভারতবাসী এহেন কাজে অগ্রসর হয় সে কথার জবাব আমার নিজের মাঝেই পেয়েছিলাম। অর্থাভাব হল প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ হল জাতীয় ভাবের অভাব। আমাদের দেশে জাতীয় ভাবের জাগরণ হয়েছে বৃটিশদের আগমনের বহু পরে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সংগে। জাতীয় ভাব না গড়ে উঠার জন্যে বিদেশী দায়ী নয় মোটেই দায়ী আমাদের ধর্ম এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মাবলী। এখন ও মানুষের তৈরী করা ধর্ম আমাদের পায়ে যেমন কুড়াল মারছে, আমাদের সমাজ আমাদের যেমন করে পংগু করে রাখছে তেমনটি অন্যত্র দেখা যায় না। তবে সুখের বিষয় আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড এত নরম যে যখনই কেউ এতে মামুলী আঘাত করবে তখনই তা ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। খালিগায়ে বসে পৈতা জড়িয়ে বাজে প্রবন্ধ লিখার মূল্য এখনই কমতে আরম্ভ হয়েছে ভবিষ্যতে আরও হবে। যদি আমার কথার প্রতিবাদ কেউ করেন আর বলেন যে এখনও আমাদের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তরে আমি বলব এটা বৃটিশের একটা অনুগ্রহ।

কয়েক দিনের মাঝেই টিকেট কেনার কাজে লেগে গেলাম। তথায়ও নানারূপ প্রতিবন্ধক এসে উঁকি মারতে লাগল। এরূপ বিপদ উঁকি মেরে দেখবার প্রধান কারণ ছিলো আমার জাত ভাই ভারতবাসীই। কোনও ইংরেজ আমার পেছন ঘুরছিলনা। আমি কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কার সংগে কথা বলছি, এসব লোক সকল সময়ই দেখছিল।

আমেরিকার জাহাজ চড়ে ফিলিপাইন যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম, সেজন্য আমেরিকার জাহাজ কোম্পানির অপিসে যাওয়া আসাও করতে হয়েছিল! আমেরিকার জাহাজী

কোম্পানির একজন গন্যমান্য লোক আমাকে ডেকে বললেন আপনার বিরুদ্ধে হিন্দুরা উঠে পড়ে লেগেছে। আপনার সম্বন্ধে স্থানীয় বৃটিশ পুলিশ আফিসে এবং বৃটিশ কনসালের সংগে কথা বলেছি, তারা কেউ আপনার বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি অথচ আপনার দেশের লোক কেন যে আমাদের কাছে পর্যন্ত রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তার কারণ খুজে পাচ্ছি না। আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, সাম্রাজ্যবাদীদের পলিসিই হল "Keep the dogs busy" এদের ত আর কোন কাজ নাই। সেজন্যই তারা আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেদিনই আমার টিকেট কিনা হয়ে গিয়েছিল আর সাত দিন পরই আমাকে সাংহাই পরিত্যাগ করার দিন ঠিক হল। সাতদিন বসে থাকা চলে না, আমি সাংহাই শহরটা আবার দেখতে লাগলাম। দেখার পথ সুগম ছিল। যথায় যেতেছিলাম তথায়ই আমার সংগে একজন লোক সর্বদাই থাকত। চীনা গোয়েন্দা আমার পেছন নিতনা কারণ ইন্‌করমারদের যদি নিজের পয়সা খরচ করে গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে হয় তবে আর কিছুই থাকেনা। সাংহাই সম্বন্ধে 'মরণ বিজয়ী চীনে' অনেক কথাই বলা হয়েছে সেজন্য এখানে আর নতুন করে সাংহাই সম্বন্ধে কিছুই বল হল না।

ক্রমশঃ—

সূর্য্য-গোত্রী

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

অনন্ত কালের বালুতটে
সূর্য্য ও আলেয়া ;
তোমার উজ্জ্বল মুখপটে
সে আলোর খেয়া।
যেমন সূর্য্যের রশ্মি লিখা,
অয়ি নিরুপমা,
হয় যদি শুধু মরীচিকা
তোমার সুষমা—
তবুও জ্বালুক্ ঐ শিখা
দৈবের দেয়া :
কাছে এসো তবু তাহলেও
দাঁড়াও নিকটে,
সূর্য্যের মতন তোমাকেও
করে' যাব ক্ষমা ॥

নবসৃষ্টি আনো

সত্রাজিৎ

নতুন সৃষ্টির পথে কি বিচিত্র সুর,
ধ্বনিয়া উঠিছে আজি শৃঙ্খলিত পুর।
যে কামনা জাগে আজ মানুষের মনে,
শতকণ্ঠে সাড়া দেয় ব্যথিতের সনে।
না জানি দিয়েছে কে সে মুক্তির সন্ধান,
উতরোল হলো হিয়া, প্রাণ স্পন্দমান।
মলিন বসন আর জীর্ণ কন্থা পরি'
গুমরিয়া কেঁদে মরে বিশ্বে নরনারী।
ওগো ভাঙনের সৃষ্টিছাড়া—
অকল্যাণ মাঝে আনো, কল্যাণের সাড়া।
শত শতাব্দীর এই ক্রন্দনের মাঝে—
রিক্তের বেদনা বহ্নি বুকে মোর বাজে।
ধুর্জ্জটীর শিঙা ফুঁকি জাগাও সবারে,
এ বিশ্বে কাঁদিছে প্রাণ হাহাকার সুরে।
নবসৃষ্টি আনো আনো, গাহ জয়গান—
মুক্ত হস্তে ফিরে দেবে মোদের সম্মান।

সুন্দর সমুদ্র *

শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যে ঘরে গ্রামের ডাকঘর তারই অর্ধেকটাতে মিসেস্ মগ্‌সের ছোট্ট দোকান। পাদ্রি মিঃ ডে'র একান্ত বিশ্বাস, কোন রবিবারে বা ছুটির দিনে যদি মিসেস্ মগ্‌স্ একবার সমুদ্র দেখে আসেন, তবে নিশ্চয় তাঁর আত্মার মুক্তিলাভ ঘটবে।

আপন মনে বলেন তিনি : "ওই রং আর জুতোর কালি, আর সুতোর গুলি আর কলম-ধোয়ার সরঞ্জাম—এর মধ্য থেকে আত্মা ওঁর নিশ্চয় হাঁপিয়ে ওঠে, অন্ততঃ দু'একঘণ্টার জন্যেও বাইরে ছুটে যেতে চায় বইকি!"

শীতকাল। ভাঙা পাথরের রাস্তায় মাঝে মাঝে জমে আছে জল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে পা ফেলে মিঃ ডে এসে পৌছান ডভারডাউনের দোকানটিতে। ডাকটিকিটের দাম চুকিয়ে দিয়ে বলেন : "আপনার দেখে আসা উচিত মিসেস্ মগ্‌স্, সমুদ্র কি সুন্দর!"

"বেশ তো আছি।" মিসেস্ মগ্‌স্ বলেন : "ঢেউয়ের শব্দ এখান থেকেই শুনতে পাই। অত দূরে গিয়ে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়না।"

মিঃ ডে সমুদ্র বর্ণনা সুরু করেন : "নীল আকাশের মত সুন্দর! কি চমৎকার রং! ঠিক্—ঠিক্—" কথা খুঁজে না পেয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বলে ফেলেন : "ঐ আপনার উঁচু তাকের লজেন্সগুলোর মত।"

"কিন্তু বড় দূর।"

"নাঃ, এমন আর কি? মাত্র আধ মাইল"—মিঃ ডে বলেন।

সব জিনিষ নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখা মিসেস্ মগ্‌সের অভ্যাস। দোকানের সামান্য জিনিষটিও কখনও অস্থানে থাকেনা। কোথায় কোন্ জিনিষটির জন্য হাত বাড়াতে হবে সব যেন তাঁর মুখস্থ। শান্ত, প্রসন্ন গোলগাল মুখখানি, মাথার দু'ধারে কোঁকড়ানো দু'টি চুলের গুছি, মাথা নাড়লেই যেন কানের কাছে ঘণ্টা দুটি দুলে ওঠে। তাই তো মিসেস্ মগ্‌স্ যখন মাথা নেড়ে বলেন, "আর তো বোতলে লজেন্স্ নেই খুকি।" বেটি প্রিংএর তারি মজা লাগে, সে বলে : "বারে ঘণ্টা বাজছে যে!"

বসন্তের দিন। মিসেস্ মগ্‌স্‌কে দু'টি শাদা ইঁদুর উপহার দিয়ে পাদ্রি সাহেব বলেন : "হয়তো একা একা বসে খেলা করতে মন্দ লাগবেনা এদের নিয়ে। অবশ্য সমুদ্রের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা হয়না এদের।"

মিসেস্ মগ্‌স্ জবাব দেন : "সমুদ্র কি আর এত সুন্দর? কথ্‌নই নয়।" ইঁদুর দুটিকে একটি দেরাজে বন্ধ করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবেন : বেশ থাকবে ওরা ওখানে। জরুরী কাগজপত্র তো অন্য ড্রয়ারেই রেখেছি।

ডভারটনের সবাই প্রশংসা করল সেই শাদা ইঁদুর দু'টির —মিঃ ডে'র দেওয়া সেই শাদা ইঁদুর; আর মিসেস্ মগ্‌স্ তো তাদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা—তাঁর কাছে তারা সমুদ্রের চেয়ে অনেক—অনেক সুন্দর।

মিসেস্ মগ্‌সের করুণা মাখানো মুখ—তৃপ্তির আভায় উজ্জ্বল। ক্বচিৎ তাতে পড়ত ভয় ও উদ্বেগের ছায়া, যখন শহর থেকে পোষ্টমাস্টার সাহেব এসে সজোরে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তেন ডাকঘরে আর সুরু করতেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

বেশীর ভাগ প্রশ্নই টাকাকড়ি সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি এমন কঠোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন, যেন সব অপরাধ তিনি ধরে' ফেলেছেন, মিসেস্ মগ্‌সের হিসাবপত্তের গরমিল কিছুই তাঁর জানতে বাকি নেই।

"টিকিটের একটি পয়সাও কারও কাছে বাকি রাখলে কিন্তু আপনি বিপদে পড়বেন" তর্জন করে' বলেন মিঃ হাণ্ট।

মিসেস্ মগ্‌স্ শঙ্কিত চক্ষে তাকান প্রশ্নকর্তার পানে, যেন

* টি. এফ্. পাওয়িসের রচনা থেকে অনুবাদ

সেই মুহূর্তে ঘোষিত হবে কঠিন দণ্ডাদেশ। শাসনে ভ্রূকুটিতে চোখে দেখা দেয় জল, কানের পাশের ঘন্টা দু'টি যায় স্থির হয়ে। পোষ্টমাস্টার সাহেব বড়মাত্রুষী ভঙ্গীতে পা দু'খানা মেলে দিয়ে ঈষৎ মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করেন: "সমুদ্র কতদূর এখান থেকে?"

ইতিমধ্যে বেটি প্রিং এসে দাঁড়িয়েছে দোকানের দরজার ধারে, চাইছে জুতোর ফিতে। তাড়াতাড়ি তার হাতে এক-কৌটো মরীচের গুঁড়ো দিয়ে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন মিসেস্ মিঃ মগস্, "আমি তো যাইনি কখনও সেখানে, তাই ঠিক জানিনা। ডে প্রায়ই বলেন বটে—ওহো বেটিকে যে জুতোর ফিতে দিতে মরীচগুঁড়ো দিয়ে ফেলেছি। আহা, বেচারি তো চলে গেছে।"

মাঝে মাঝে মিসেস্ মগস্ দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে ওঠেন। যেন কতকগুলি ডাকটিকিট আর পোষ্টাল অর্ডার হারিয়ে গেছে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শীতের রাত্রে যখন বাতাসে আইভিলতা শিরশিরিয়ে ওঠে, কিংবা বসন্তের রাতে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়ে, ঘুমের ঘোরে তিনি শোনেন মিঃ হাণ্টের উগ্র গর্জন; "মিথ্যাবাদী! চোর!" বর্ষীয়সী মহিলা, দয়ায় ভরা মন, এ কি লাঞ্ছনা তাঁর! 'চোর' অপবাদেও তাঁর তত দুঃখ হ'তনা,—বাইবেলে তিনি পড়েছিলেন, একজন চোর মৃত্যুকালে ভগবানের সঙ্গ এবং স্বর্গের আশ্বাস পেয়েছিল,—কিন্তু 'মিথ্যাবাদী' এ অপবাদ অসহ্য। মিঃ হাণ্ট এমনি চেঁচিয়ে ঐ কথাটা উচ্চারণ করেন যে মিসেস্ মগ্‌সের ঘুম ভেঙে যায়; তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়েন; মনকে শান্ত করবার জন্যে বসে' বসে' ভাবেন মিঃ ডে'র কথাগুলি—সুন্দর সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা!

বসন্ত এসেছে। সোণালী বালির তীরে দাঁড়িয়ে মিঃ ডে ভাবছেন, মিসেস্ মগ্‌স্ যদি একবার এসে সমুদ্র দেখে যেতেন। এমন সুন্দর, এমন স্বচ্ছ, ছোট ছোট মাছগুলি খেলা করছে, জলের তলায় ঝিকমিক করছে রঙিন পাথর!

"এখানে এলে তাঁর আত্মা অনন্তের পানে ছুটে যেতে চাইত, নিশ্চয়", মিঃ ডে মনে মনে ভাবেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান দূর দিগন্তপানে, যেখানে একসঙ্গে মিলেছে সমুদ্র আর আকাশ।

"প্রত্যক্ষের সীমায় বাঁধা থাকতনা তাঁর আত্মা, ছুটে যেত ভগবানের অনন্ত মহিমার সন্ধানে।"

ছোট্ট শাদা ইঁদুর টনিকে হাতে নিয়ে বেটি প্রিং আদর করে, চুমো খায়, সস্নেহে তাকিয়ে দেখেন মিসেস্ মগ্‌স্।

"কি সুন্দর! আর কি দুষ্টু! আচ্ছা, গার্টিকেও একটু হাতে নিই না?" বেটি জিজ্ঞাসা করে।

মিসেস্ মগ্‌স্ মাথা নাড়েন, খুশিতে দুলে' ওঠে ছোট্ট ঘন্টা দু'টি, গলা খাটো করে' বলেন: "চুপ, চুপ, গার্টি বোধ হয় বাসা বাঁধছে, এখন আমরা বিরক্ত করব না তাকে, কেমন? কিছুদিন যাক, টনির মত অমনি একটি ইঁদুরছানা তোমায় আমি দেবো।" বলে' ডাকটিকিট ক'খানি বেটির হাতে দেন, পয়সার কথা আর বলেন না। "যাক্, কাল পেলেই হবে" বলে' নিশ্চিন্ত মনে আপন জায়গাটিতে ফিরে আসেন, সেই ছোট্ট ঘন্টা দু'টি বাজে।

পরদিন ভোরে অনেক আশা আর আনন্দ নিয়ে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন, নিচে গিয়ে দেরাজ খুললেই নোতুন ইঁদুর-ছানাটি দেখতে পাবেন। আরও আনন্দের কারণ, পোষ্টমাস্টার সাহেব অনেকদিন এদিকে আসেননি, বোধ করি এ গ্রামের কথা ভুলেই গেছেন। সরল বিশ্বাসে তিনি ভাবেন, আর আসবেন না হয়তো।

ধীরে পোষাক বদলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলি ঠিক্ করে' নেন মনে হয়, দূরে কোথায় মিঠে স্বরে দু'টি ঘন্টা বাজছে।

দেরাজ খুলে গোণেন, ক'টি বাচ্ছা হয়েছে ইঁদুরের: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। খুশিতে মশগুল। উপরের দেরাজ ফুটো করে' ইঁদুরেরা যে নিচের দেরাজে যাতায়াত করছে, সে তাঁর চোখেই পড়ে না। নিচের দেরাজেই থাকে ডাকটিকিট, পোস্টাল অর্ডার আর জরুরী কাগজপত্র। চশমাটা মুছে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে' তিনি দেখেন সুন্দর বাসাটি—রঙিন টুকরো কাগজের তৈরি। হঠাৎ চমকে ওঠেন। একখানা মোটরগাড়ি দরজায় দাঁড়ালো। আরোহী নামলেন!

মিসেস্ মগ্‌সের মুখ শাদা হয়ে গেল। বিশ্রী আওয়াজ করে' ঘরে ঢুকলেন মিঃ হাণ্ট, হিসেব চাইলেন ডাকটিকিট আর পোস্টাল অর্ডার বিক্রির।

মিসেস্ মগ্‌স্ শশব্যস্তে খাতাপত্র খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়ে বেটি প্রিং এসে দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল: "ডাক টিকিটের দামটা।" মিঃ হাণ্ট কটমট করে' তাকাতেই বেটির হাত থেকে পয়সাগুলি পড়ে' গেল।

হিসেবের উপর চোখ বুলোতে বুলোতে মোটা গলায় মিঃ হাণ্ট বললেন: "হুঁ, বুঝেছি। বাকি স্টক কোথায়?" মিসেস্ মগ্‌স্ যা-যা হাজির করেছিলেন সব গুণে নিয়ে আবার বললেন: "বাকি সব ডাকটিকিট আর পোস্টাল অর্ডার কোথায়?"

অপরাধীর মত বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে বলতে চেষ্টা করেন মিসেস্ মগ্‌স্: "ইঁদুরে—"

"মিথ্যাবাদী"—গর্জে ওঠেন মিঃ হাণ্ট।

মিসেস্ মগ্‌সের মনে পড়ে সমুদ্রের কথা। কোথায় যেন মিলিয়ে যায় সেই দোকান আর ডাকঘর, আর দুঃস্বপ্নের মত মিঃ হাণ্টের মূর্তি, সামনে জেগে ওঠে সমুদ্র,—ঠিক মিঃ ডে'র বর্ণনার মত।

মিঃ হাণ্ট চলে গেলেন ডভারডাউন থেকে, তাঁর শেষ কথা আর মিসেস্ মগ্‌সের কানে পৌঁছয়নি। তিনি শুনেছিলেন শুধু একটা গালি, জানালা দিয়ে মুগ বাড়িয়েছিল বেটি প্রিং, কে জানে হয়তো সেও তা শুনেছে।

মিসেস্ মগ্‌স্ ক্লোকটা গায়ে চড়ালেন। গলির মোড়ে দেখা হল মিঃ ডে'র সঙ্গে। শীতের দিনে পথের ধারে জল জমে থাকে, তাই তখন যেমন সন্তর্পণে পথ চলেন, এখনও তেমনি করেই চলেছেন অবাক্ হয়ে ভুরুর উপর হাত রেখে তিনি চেয়ে দেখেন।

"সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি, সুন্দর সমুদ্র" বলে' মুখখানি ফেরাতেই মিসেস্ মগ্‌সের চুলের গুছিতে দোল লাগে, মনে হয় ছোট্ট দুটি ঘন্টা বাজছে।

আহ্বান

শ্রীগোপাল ভৌমিক

তবে তাই হোক্:
মেরু-প্রান্তে থাকো তুমি
আমার থাকুক জ্যোতির্লোক।
তোমার প্রেমের দুর্গে প্রচুর প্রহরী:
আমি যদি নিতান্তই ডরি—
তবে কি সে অন্যায় এমন?
তুমি তবে ভীরুর মতন—
নিজেকে এমন করে যেন রাখো ঢেকে—
এখনও কি শিখ্‌লে না ঠেকে?

তোমাকে চাই নি' শুধু নির্জন সন্ধ্যায়:
অন্ধকারে গায় গায়—
অসংলগ্ন পেঁচার মতন—
এই কি জীবন?
তোমাকে চেয়েছি পেতে জনতার মাঝে:
যেখানে হৃদয়-তন্ত্রে বাজে—
শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়,
আর সেই সুদূর স্বপন—
রেখেছে আচ্ছন্ন করে জনতার মন।
তোমাকে পাবোই পাবো অকুণ্ঠ সে ভীড়ে—
বিদ্যুৎ-তিমিরে:
এই স্বপ্ন দেখে দেখে কেটে গেল দিন—
তুমি তবু গিরি-দুর্গ-লীন?

ভীরু মেয়ে, ভাঙো মিথ্যা ভয়:
সুনিশ্চিত আমাদের জয়।
তোমাতে আমাতে মিলে—
জনতার মিছিলে মিছিলে—
চেতনার বহ্নি দেব এনে—
আজও যারা শক্তিহীন নিজেকে না জেনে।
হও তুমি ইস্পাত-কঠিন:
আনো আনো প্রজ্বলন্ত দিন,
দেহ-রক্তে নিয়ে এস বিদ্যুৎ-স্পন্দন—
আর কিছু মন।
ভেঙে ফেলো সঞ্চিত সম্মোহ—
যাক্ দূরে মিথ্যা অবরোহ!

স্বাস্থ্যবান শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ

নিওভিট্

আপনার শিশুকে
স্বাস্থ্যবান করবে।

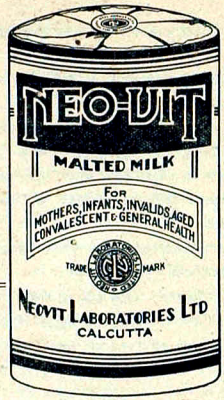

নিওভিট্ ল্যাবরেটরিস্ লিঃ
৯এ, সাহানগর রোড, কলিকাতা।

একে জিনিষ ভাল, তারপর সবই স্বদেশী

বেঙ্গল
ইলেকট্রিক ল্যাম্প

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক
ব্যবহৃত ও অনুমোদিত।

ও, এম, সি,
ইলেকট্রিক ফ্যান্

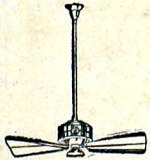

দুই বৎসরের জন্য
গেরাণ্টী।

ও, এম, সি,
ওটোমোবাইল ও ষ্টোরেজ্ ব্যাটারী

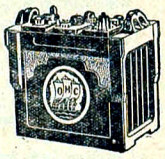

নিরাপদ ও
নির্ভরযোগ্য।

এজেণ্টস্ঃ—

দি ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোং লিঃ

৩৬এ এবং বি, প্রতাপাদিত্য রোড্,
টেলিফোন ঃ—সাউথ ঃ ২৩৭৪ (২ লাইন)
টেলিগ্রাম ঃ—"সেলাস।"

ব্রাঞ্চ—১১, ব্যাঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বে।
টেলিফোন ঃ—৩১৩৯৪
টেলিগ্রাম ঃ—"ওরিমারকো"।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের ভূমিকা

শ্রীজীবনময় রায়

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিস্ময়কর কিন্তু আকস্মিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র পূর্ব্ব যুগের উদ্যোগ পর্ব্বটির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের মনের মধ্যে একটি পরিষ্কার ভাব থাকা চাই। কয়েকটি কথা মনে রাখিলেই সেই ধারণা আমাদের মনে সহজ হইবে।

প্রথম—ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজত্ব যে পাশ্চাত্য কর্ম্মপ্রধান জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন ধর্ম্মনীতি ও চিন্তাপদ্ধতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহার সহিত আমাদের কর্ম্মবিমুখ প্রাচ্য মনের সংঘাতে নূতন চিন্তা, চেষ্টা ও নবজাগরণের সূচনা হয়।

দ্বিতীয়—রামমোহন রায়ের দ্বারা উপনিষদ ব্রহ্মবাদ ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনকৃত মহম্মদীয় একেশ্বরবাদ ও খ্রীষ্টীয় নৈতিক ধর্ম্মের প্রভাবে এক নব সংস্কৃতির বিপুল প্রেরণা জাগিয়াছিল। এই ত্রিধারাসঙ্গম ও প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষের সমাজ ধর্ম্ম, জীবন ও রাজনৈতিক পরিবেশ নূতন তাৎপর্য্য ও মর্য্যাদায় জাগ্রত হইয়া উঠিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —গতনিদ্র অজগরের বহুকুণ্ডলায়িত নিদ্রাবেশ হইতে জাগরণের মত—এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার গণ্ডী ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তির আহ্বানে এক বিরাট সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করিল।

তৃতীয়—এই মুক্তিমন্ত্রের প্লাবনকে ভারতবর্ষের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া—বৃহত্তর হিন্দু সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদ রূপ জাতীয়-সাধনায় প্রবাহিত করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সমাজসংস্কারে, প্রগতিশীল পরিকল্পনা ও চেষ্টায় তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা দেশের চিত্তে এক অভিনব উত্তেজনা ও ভাব রসের গঙ্গাধারা প্রবাহিত করিল। রাজনারায়ণ বসু, জ্ঞাশনাল নবগোপাল, জ্যোতিরিন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি উৎসাহী সভাগণের লেখনী চালনায় এবং মহর্ষির প্রেরণায় এক নব ভাবের বন্যা সমস্ত বাংলাদেশে বহিয়া গেল।

চতুর্থ—দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীর আবহাওয়ায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট এই প্রভিভাবান যুবীমণ্ডলীর প্রভাব দক্ষিণাপবনের দাক্ষিণ্য বিতরণ করিত। এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রগণও প্রতিভাশালী মহদাশয় এবং নানা সংস্কারের প্রবর্ত্তকরূপে জোড়াসাঁকোর গৃহাঙ্গণকে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে, কলায়, জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় মুখরিত করিয়া রাখিতেন। এই আবহাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে স্বপ্নপ্রয়াণের যুগ। এই স্বপ্নপ্রয়াণের অদ্ভুত শব্দ, চিত্র, কল্পনা ও ছন্দের লীলা তাঁহার শিশু চিত্তকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল এবং উত্তরকালে তাঁহার রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পঞ্চম—রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাহিত্য প্রীতি ও তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ।

ষষ্ঠ—তাঁহার পল্লীপ্রীতি ও বাউল সঙ্গীতের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ।

এই সকল কথা মনে রাখিয়া রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমাদের পক্ষে তাঁহাকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে।

রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রতিভায় 'সম্পূর্ণ' নিজস্ব ভঙ্গীতে বাংলায় ছোটগল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের অন্যতম বলিয়া অবিসম্বাদী আসন লাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ছোট গল্প লেখার প্রচলন প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা ছিল তাহাকে ছোট গল্প বলা চলে না—কোনও প্রকারে জোড়াতাড়া দিয়া কয়েকটা ঘটনার সমাবেশ বলা চলে মাত্র; তাহারও সংখ্যা অঙ্গুলীপ্রান্তে নিঃশেষিত হইবার মত।

ছোট গল্পের প্রথম আঙ্গিক হইল এই যে বিশেষ একটি ব্যক্তির জীবনের একটি ঘটনা বা ভাবকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে তাহার চতুর্দ্দিকে গল্পটিকে ফুটাইয়া তুলিতে

হয়, এবং সেই নাটকের উপর যবনিকা টানিবার পর উক্ত ঘটনা বা ভাব যেন একটি চরমতম অভিব্যক্তিতে পাঠকের চিত্তে তাহার অনুভূতিমগুলের প্রদোষ-অন্ধকারে একটিমাত্র শুক-তারার মত প্রোজ্জ্বল হইয়া থাকে। ছোট গল্পের দ্বিতীয় আঙ্গিক এই যে তাহা ছোট হইবে অর্থাৎ (Edgar Allen Poeর মতে) তাহা আধ ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পকে মোটামুটি আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইতে পারি। যথা (১) কল্পনাত্মক, যেমন 'ক্ষুধিত পাষাণ' (২) আবহপ্রধান, যেমন "হালদার গোষ্ঠি" (৩) গল্প-প্রধান, যেমন 'নষ্টনীড়' (৪) মিশ্ররসাত্মক, যেমন "মণিহারা"।

এ সমস্ত সংজ্ঞাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব করিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে প্রধান হইয়া দেখা দেয় তাহার অপূর্ব্ব ও সূক্ষ্ম মনোবিকলন। নিপুণ জীবতাত্ত্বিকের মত ল্যান্সেট হাতে লইয়া মানুষের চিত্তের সমস্ত গোপন অংশ তিনি যেন চিরিয়া চিরিয়া চুণিয়া চুণিয়া বাহির করিয়াছেন। বাঙলা গল্পে এইরূপ বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণ রীতি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। এই মনোবিশ্লেষণই তাঁহার গল্পের প্রাণস্বরূপ।

গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ তাঁহার ছন্দসমুচ্ছল ঐশ্বর্য্যময়ী ভাষা। যে ভাষা আজ সমস্ত বাঙলার গৌরবের বস্তু এবং সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভাণ্ডারে যাহা এক মুহূর্ত্তে আপন প্রতিষ্ঠার আসন জয় করিয়া লইল।

এই ভাষা আজ সমস্ত বাঙলা সাহিত্যিকের ভাষা এবং এই মনোবিকলন ভঙ্গী আজ সমস্ত গল্পলেখকের আদর্শ। এই ভাষার ব্যঞ্জনা ও মুদ্রা বাঙলার শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের চিত্তে এমনই অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে যে শিরা উপশিরার রক্তসঞ্চালন ব্যাপারকে যেমন আমরা বোধশূন্য চিত্তে গ্রহণ করি রবীন্দ্র-নাথের ভাষাভঙ্গী এমন কি তাহার শব্দচয়নবৈশিষ্ট্যটি পর্য্যন্ত সেইরূপভাবে তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন। শুধু তাঁহার ভাষা ও মনোবিশ্লেষণভঙ্গী নয়; তাঁহার চিন্তাপ্রণালী, যুক্তি, তর্কবিচার, উপমা, রসিকতা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বাকচাতুরী এমনি তাঁহার গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলি পর্য্যন্ত এবং তাহাও বহু স্থলে তাহাদের বিকৃত সংস্করণ—যেন গোরার কথা অবিনাশের মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রণালী অভিনব। তাহা ধারাবাহিকতার ধারা ছাড়িয়া নব নব বিস্ময়ের আঘাতে অসীম অগোচরকে প্রত্যক্ষ গোচর করিবার প্রণালী। আজও একথা অনেকেই স্মরণ করিতে পারিবেন যে, কোনো সভায় বহুজনের বহু বক্তৃতার পর যখন বক্তাদের আর বলিবার কিছুই বাকী নাই, এবং বারংবার একই কথা নানাকণ্ঠে শুনিতে শুনিতে মানুষের বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে, তখন রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া বিষয়টির উপর তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির রঞ্জনরশ্মিপাতে তাহার সম্পূর্ণ একটি অন্তর্গূঢ় নবীনরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন যাহা কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। তাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অভিনব। প্রত্যক্ষের স্থূল আবরণের অন্তরালে যে সংবস্তু যে গূহাহিত আত্মা বিরাজ করে স্বভাবিক ধ্যানপ্রতিভা ব্যতিরেকে কেহ তাহাকে উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টির মধ্যে সেই অপ্রত্যক্ষকে দেখিবার দৃষ্টি ভঙ্গী দান করিয়াছেন—যে দৃষ্টির আলোকে অকিঞ্চণের অন্তরালে বিভূতিকে, ক্ষুদ্রের অন্তরালে ভূমাকে এবং সামান্যের অন্তরালে অভিনবকে আবিষ্কার করিয়া দেখায়। তাই জন্মমৃত্যু ও জীবনের বিচিত্র ঘটনা এবং সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাহাদের অনাস্বাদিতপূর্ণ নবীন রসে মণ্ডিত হইয়া আমাদিগের জীবনে অধিকতর সরস ও সুন্দরের মহিমাকে প্রকাশ করিয়াছে। রূপ ও অরূপের দ্বন্দ ও ব্যবধান সহসা অন্তর্হিত হইয়া ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসার বাতায়ন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই মর্ম্মকথা, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের এই প্রাণ, রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসের যে নরনারীর জগৎ তাহা জীবনের নূতন তাৎপর্য্য ও নূতন মূল্যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চরিত্রস্রষ্টাগণের নরনারীর জগৎ হইতে এই মন্ত্রেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই আজ গোরা, পরেশ, আনন্দময়ী, বিনোদিনী, কেটি মিত্র, অমিট রায়, উর্ব্বশী, দামিনী, কবিশেখর, শা' জাহান তাহাদের কীর্ত্তির চেয়ে মহত্তর রূপে, রসে-বর্ণে-বৈচিত্রে আমাদের মনকে এক নূতনতর জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে এবং পরবর্ত্তী গল্পলেখকদিগের চরিত্রসৃষ্টিকে এমন অসাধারণ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগ প্রায় শোনা যায়

যে—তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য লিখিয়াছেন—বাঙলার মাটির সঙ্গে বাঙলার আপন জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার সংস্রব খুব বেশী নয়। কিন্তু এই কথাটির মধ্যে সত্য অতি সামান্যই আছে। বাকীটুকু রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য দেশী ও বিলাতী শিক্ষা এবং পারিবারিক ঐশ্বর্য্য ও আবেষ্টনী কল্পনা করিয়া চিন্তাহীন সমালোচকের অত্যুক্তি মাত্র। তাহার প্রথম কারণ রবীন্দ্রনাথ অসামান্য হইয়াও সামান্য এবং দরিদ্রতম জীবনের সহিত পরিচিত হইবার স্বাভাবিক পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং তাঁহার নিজ প্রতিভাবলে তাঁহাদের জীবনের সামান্যতম ঘটনাকেও তাহার প্রকৃত রস ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে দর্শন করিবার ক্ষমতা লইয়াই জন্মিয়াছিলেন; এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অত্যানুভূতিসম্পন্ন কবিহৃদয়ের সহমর্ম্মিতার গুণে তিনি অনায়াসে উচ্চতম হইতে তুচ্ছতমের অন্তরলোকের রসমণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথের শিশুকালে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান এতটা উগ্র হইয়া উঠে নাই। ধনী ও দরীদ্র পরস্পরকে ধনী ও দরিদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই একই বৈঠকখানায় একই ফরাসের উপর জমায়েৎ হইয়া বসিয়া আসর সরগরম করিয়া রাখিত। নিজেদের মধ্যে একদিকে অভিমান ও পরশ্রীকাতরতা এবং অপরদিকে মদগর্ব্বিত চিত্তের অত্যুগ্র আত্মচৈতন্য উভয়ের মধ্যে স্বর্গ নরকের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধনী হইয়াও পদব্রজে সামান্য বস্ত্রে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন ও সকলের সঙ্গে মিশিতেন; এবং এক সময়ে শিশুকালে তাঁহাদের দাসদাসীকে অর্দ্ধ অভিভাবকবৎ জানিয়া স্নেহে ও সম্ভ্রমে তাহাদের সহিত একীভূত হইয়া থাকিতেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষে সে এক সামান্য ক্ষেত্র ছিল না। তৃতীয় কারণ তিনি যৌবনে নিজেদের জমিদারী শাসনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এদেশের মধ্যে যখন প্রথম পল্লীসংস্কার এবং দুর্গত ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সহিত "সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ" বলিয়া ভারতবর্ষকে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন উচ্চ মঞ্চ হইতে "দীনজনে দয়া কর" এর বেশী উপদেশ কেহ দেয় নাই। চতুর্থ কারণ, তুচ্ছতম ব্যাপারের মধ্যে মিশিয়া আমাদের দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মর্ম্মে তিনি প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য তিনি নগ্নপদে সামান্য বস্ত্রে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন। গোরার মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে!

অতএব "বাঙলার মাটির সঙ্গে বাঙলার আপন জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সংস্রব খুব বেশী নয়" রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একথা বলা হয় অজ্ঞতাবশতঃ।

রবীন্দ্র সাহিত্যের আর একটি আশ্চর্য্য গুণের কথা না বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার টানিতে পারিতেছি না। তাহা রুচির শুচিতা। আশ্চর্য্য বলিবার কারণ এই যে, যে যুগে এই গুণের প্রবর্ত্তন তিনি সাহিত্যের মধ্যে করিয়াছিলেন সে যুগে, হাস্যরস অশ্লীলতার নামান্তর এবং ভণ্ডামি কৌতুক বলিয়া অভিহিত হইত। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্পর্কে রুচির এবং শুচিতার বাংলা খুঁজিয়া হতাশ হইয়া অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ইংরাজীতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "Refined delicacy as opposed to vulgarity of taste.", বলিয়াছেন যে, "কোমলতা বা মার্জ্জিত রুচি বলিলে এটিকে ঠিক বুঝাইবে না। এমন একটি কথা যাহাতে (জয় পরাজয় গল্পের) কবিশেখর এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীকের মধ্যকার মানসিক পার্থক্য বুঝাইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের কবিশেখর।"

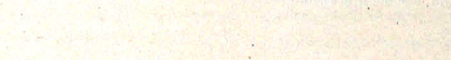

মায়াবি টেবিল

বুদ্ধদেব বসু

তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ ; মায়াবি টেবিলে
সংকীর্ণ আলোকচক্রে মগ্ন হও ; মনীষার বীজ
জন্ম দিক সুন্দরীকে, যার গান সমুদ্রের নীলে
কাঁপায়, জ্যোছনায় যার ঝিলিমিলি-জ্বলন্ত শেমিজ
দিগ্বিজয়ী জাহাজেরে ভাঙে এনে পুরোনো পাথরে।
কল্পনার নিশ্চিত্র সমুদ্রে হও নিঃসঙ্গ নাবিক।
আদিগন্ত অন্তহীন তরঙ্গের রঙ্গমঞ্চ-'পরে
অপরূপ দ্বীপপুঞ্জ জেগে ওঠে, ফোটে ঝিকিমিক
কুমারী আমেরিকার উজ্জ্বল শ্রোণীর আভা, জ্বলে
অদ্ভুত চিন্তার আলো কালো জলে, কালস্রোতে।
এই
হও। হও রিক্ত, অতএব বীতভয়।
মুক্তি দোলে
মালা হ'য়ে, কারণ প্রয়োজনের অবরোধ নেই।
জীবিকার প্রশ্ন তুচ্ছ ; জীবনে বৈকুণ্ঠ অধিকার।
কোনো ক্ষোভ নেই, আছে সত্তার ইচ্ছার ব্যবহার।

চলন্ত

অজয় ভটাচার্য

চাঁদ ল'য়ে গান আমাদের কাজ নয়,
আষাঢ়ী মেঘের নীলাম্বরী-ও মিছে,
ভালো বাঁকা চাঁদ যদি সে কাস্তে হয়,
ফসলী বৃষ্টি থাকিলে মেঘের পিছে।

নগর কোথায় উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে—
কি কাজ হিসাবে যদি সে না দেয় ঠাঁই ?
ইন্দ্রপ্রস্থে থাকে যদি ছেঁদো কুঁড়ে
বেদব্যাস যে ফাঁকির জুয়ারী ভাই।

নদীর গীতালি জাহাজী বণিক শুনে,
কাশের গুচ্ছে রূপার রূপালী জাঁক—
ছেঁড়া পালে ডিঙ্গা আমি যদি টানি গুণে
তোমাদের নদী তোমাদেরি শুধু থাক্।

ভৌগোলিকের সীমার জরীপে যদি
কালনেমীদল পৃথিবীরে নেয় ভাঙ্গি'
একথা-ই তবে ব'লে যাবো নিরবধি
সবার লাগিয়া সূর্য উঠেছে রাঙ্গি'।

মেশিনগাণের মারণ-মন্ত্রে হবে
আগামী কালের পরিচয় যদি ভাই,
আমি অতীতের যাযাবর জানি তবে,
নিভে যাক্ ফুটো চলার প্রদীপটা-ই।

ভারতবর্ষ ও বিজ্ঞান

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় মনের বিজ্ঞান-বিমুখতা ইতিহাস-বিশ্রুত ব্যাপার। যে স্বাভাবিক কারণে আমরা বিজ্ঞানের নামে চম্‌কে উঠি তার উল্লেখ না করেও বলা যায় যে স্বভাবটা আমাদের বদলানো উচিত। 'ধরিত্রী মাতার' অনুরক্ত থাকাটা অন্যায় নয় কিন্তু সে অনুরাগ যখন আমাদের চোখে ঝাপসা করে তোলে—চোখ তুলে চারদিকে তাকাবার ক্ষমতা থাকে না, তখন আমাদের বোঝা দরকার যে একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে। বিজ্ঞান বস্তুটি অসুস্থ মনের আবিষ্কার নয়—মানুষ নিজেকে সভ্য করে তোলবার যে পথ খুঁজে নিয়েছে তা-ই বিজ্ঞানের পথ। এ পথের রেখা ভারতীয় শস্য-প্রান্তর থেকে বহুদিন হল মুছে গেছে সত্যি—গীর্জাগুলোকে পশ্চাতে রেখে সে-পথের ছক তৈরী হয়ে চলেছে এখন য়ুরোপে—এ কথাও মিথ্যা নয়, কিন্তু তা' বলেই যদি বিজ্ঞানকে আমরা বিদেশীদ্রব্য হিসেবে বর্জ্জন করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠি তাহলে তাকে স্বৈরিতার অসুস্থ লক্ষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বিজ্ঞান জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষের সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে বলেই আমরা তাকে আহ্বান করব। সে আহ্বান জানাতে আমাদের জ্ঞানাভিমান যদি ক্ষুণ্ণ হয় তা আর কি করা ? ভারতে যা নেই জগতেও তা দুর্লভ—এ ধারণা নিয়ে অনেক দিনই ত আমরা বসেছিলাম—অতীত-বিলাসে ত অনেকদিন আমদের কেটে গেছে, তাতে লাভের ঘরে এসে জমা হয়েছে অজ্ঞানতা আর দারিদ্র্য।

বিজ্ঞান যে সভ্যতার আলো নিয়ে এসেছে তার নাম যন্ত্র-সভ্যতা। যেহেতু এ সভ্যতাকে নিয়ে য়ুরোপে আজ দীর্ঘশ্বাস উঠেছে তারি জন্যে আমরা ভারতীয়রা খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ছি—কেননা এ সভ্যতার ফাঁদে আমরা ত পা দিই নি ! সঙ্গে সঙ্গে একথা বল্‌তেও আমরা দ্বিধা করিনে যে ভারতীয় সভ্যতা শ্রেয়কে বুঝত—এবং বুঝত বলেই বিজ্ঞানের বন্ধুর পথ বর্জ্জন করেছে। ভারতীয়দের দূরদৃষ্টিকে সন্দেহ করব না কিন্তু বিজ্ঞান-সভ্যতার সঙ্কটটা অনিবার্য্য কি না এ নিয়ে ন্যায়সঙ্গত-ভাবেই সন্দেহ করা যায়। য়ুরোপে আজ যারা ক্রিশ্চিয়ানিটির দোহাই পেড়ে মধ্যযুগকে ফিরিয়ে আন্‌তে চান, তাঁদের সঙ্গে সুর মেলাবার আগে আমাদের ভেবে দেখা উচিত বিজ্ঞান সত্যি আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে কি না। যে কোনো মহৎ বস্তু যখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার মাহাত্ম্য ঘুচে যেতে বাধ্য। ধর্ম্মকে মহৎ বলে আমরা ঘোষণা করে থাকি—কিন্তু ধর্ম্মমোহন্তদের হাতে সে মহৎ বস্তুটি যে কি বীভৎস ফল তৈরী করে তাও ত আমরা জানি। ঠিক তেম্নি বিজ্ঞানের দেওয়া যন্ত্রকে যদি কতিপয় লোক বা বিশেষ একটা শ্রেণী নিজেদের স্বার্থোৎপাদনের জন্যই ব্যবহার করতে থাকে তবে সে অপরাধ কি বিজ্ঞানের ? যন্ত্রের দেহ থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থের নিগড় খুলে ফেলে তাকে সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করলে সভ্যতার রূপটা কেমন দাঁড়ায়—এটা কি আমাদের ভেবে দেখা উচিত নয় ? রুশ-বিপ্লবের আগে যন্ত্র বেচারি কোনো দেশে সর্ব্বসাধারণের ভোগ্যবস্তু তৈরী করবার জন্যে খাটেনি—খেটেছে ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের মুনফা তৈরী করবার জন্যে। তাতে করে নদীর এক তীর ভেঙে অরেক তীর গড়বার ধাঁচে সমাজের এক শ্রেণী ক্রমেই দরিদ্রীভূত হয়ে আরেক শ্রেণী ফেঁপে উঠেছে। সামাজিক তারসাম্য গেছে বিগড়ে—তাই আজ য়ুরোপের দীর্ঘনিশ্বাস। উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে চাপাবার সজ্ঞান চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে যাঁরা আজ যন্ত্রসভ্যতার দিকে স্থিরভাবে তাকাবার সুযোগ পাচ্ছেন, তারা যন্ত্রকে বাতিল করে মধ্যযুগ ফিরিয়ে আন্‌বার উন্মাদ কল্পনা হতেও নিশ্চয়ই বিরত থাক্‌বেন। যন্ত্রসভ্যতার যন্ত্রকে দানব আখ্যায় বিভূষিত করে আমাদের বিজ্ঞানবিমুখ মন তৃপ্তি পেতে পারে কিন্তু তা সত্যনিষ্ঠার তৃপ্তি নয়, মিথ্যাভাষণের তৃপ্তি।

যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যন্ত্রকে হাতে পেয়ে মানুষ যদি

স্বার্থান্বেষী হয়ে থাকে—তাহলে মানুষকে স্বার্থান্বেষী করে তোলা যন্ত্রের স্বভাব। কাজেই এই দুশ্চরিত্রের সঙ্গ বর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর। সমস্যাটা প্রায় মনস্তত্বের এলাকায় গিয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যা থেকে আমাদের লোভ জন্মায় তাকে বরবাদ করে দিলেই কি আমরা নির্লোভ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু লোভটা কি আমাদের যন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না ধনবৈষম্যকে কেন্দ্র করে তার আবির্ভাব হয়? যন্ত্রের অপরাধ এই মাত্র যে ধনোৎপাদনে তার ক্ষমতা বিস্ময়কর। যে মাটি প্রচুর ফসল দেয় তাকে পরিত্যাগ করে নির্লোভ হবার জন্যে মরুভূমিতে বসবাস করবার পরিকল্পনা আমরা কোনদিন করেছি কি? সে উন্মত্ততা যদি আমাদের মগজে ঠাঁই না পায় তবে যন্ত্রের বেলায় এমন যুক্তির অবতারণা করি আমরা কোন্ হিসাবে? রোগ-বীজাণু রক্তকে জড়িয়ে থাকে কিন্তু তার জন্যে রক্ত-নিষ্কাষণের দুর্ব্বুদ্ধি কোনো ডাক্তার দিতে পারেন না। যন্ত্রকে জড়িয়ে যদি ধনবৈষম্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে—তাহলে যন্ত্রকে সে-প্যারাসাইট থেকে আমরা মুক্ত করে আন্‌ব। আমাদের উচিত হবে ধনবৈষম্যকে নির্ম্মূল করা—যন্ত্রের গায়ে আঘাত দেওয়া নয়।

যন্ত্রকে নিয়ে মানুষের কোনো বিপদ হতে পারে না—যদি তাদের সদন্তঃকরণ ও সদিচ্ছা থাকে। বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের বিরাগ আর যে কারণেই হোক যুক্তির পথে তা জন্মায়নি। স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা আমাদের এমনি তুঙ্গে চড়ে বসেছে যে অযৌক্তিক হতে আর আমাদের বাধে না। অথচ দিনের পর দিনই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের ফসলের ক্ষেত চল্লিশ কোটির অন্নসংস্থান করতে পারছে না—হয়ত বিজ্ঞানের সহায়তায় এ-দুরবস্থার খানিকটা উপশম হয়; দেখতে পাচ্ছি ক্ষেতে যারা লাঙল চালায় ক্রমেই তারা বেকারের সংখ্যা স্ফীত করে তুলছে—হয়ত কলকারখানায় তাদের টেনে নিলে ভাত কাপড় পেয়ে তারা বাঁচতে পারে; কিন্তু এসব দুঃখের দিকে সাধারণ মানুষোচিত দৃষ্টি কোথায় আমাদের? স্বার্থপরতায় যে-বিজ্ঞান নিযুক্ত তার প্রতিও যদি আমাদের আকর্ষণ থাকৃত তবে আর দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে নিরন্ন, নিরাকরণ হয়ে থাকতে হত না। যন্ত্রসভ্যতায় য়ুরোপের জীবন হাহাকারময় হয়ে উঠেছে বলে আমরা ধুয়া ধরেছি—কিন্তু যন্ত্রের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেদের পবিত্র রেখে এমন কি মোক্ষ লাভ হয়েছে আমাদের? যুদ্ধে যত লোক মরে তার চেয়ে বেশি লোক কি অনাহারে, বিনাচিকিৎসায় আমাদের পুণ্যভূমিতে মারা যায় না? আমাদের দেশের আকাশে কি আগাগোড়াই সামগান—হাহাকার নেই? কৃষ্ণের জীবকে কৃষ্ণই আহার দেবেন, আর কৃষ্ণ রাখলে তাকে কেউ মারতে পারে না—এই দায়িত্বহীনতা আজকের দিনে মনে পোষণ করতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু লজ্জিত আমরা হইনে। নিষ্ক্রিয়তার সহস্র অজুহাত তৈরী করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি।

যন্ত্রসভ্যতাকে গ্রহণ না করার দরুণ রাষ্ট্রিক বা সমাজিক যে দুর্গতিই অতীতে হয়ে থাক তার আলোচনা করে লাভ নেই। বর্ত্তমানে আমরা যন্ত্র সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারি অতীতে হয়ত সে সুযোগ আমাদের হত না। আজ আমরা যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপরিণতি দেখতে পাই। দেখ্‌ছি, যন্ত্র সমাজের চাকর না হয়ে শ্রেণীর চাকর হয়ে উঠলে তার ফল বিষময় হতে বাধ্য। দেখছি, যন্ত্রের চাকা ভোগের জন্যে না ঘুরে লোভ আর লাভের জন্য ঘুরলে আখেরে তা অনর্থ ঘটায়। (যদিও সে অনর্থ যন্ত্রবিমুখতার মতো দুঃসহ নয়)। দেখ্‌ছি, যন্ত্রের মালিকানা স্বত্ব যদি দেশের প্রত্যেকটি মানুষের থাকে তাহলে উপোস থেকে কাউকে মরতে হয় না—না-ই বা হোল কারু চকমিলান বাড়ী। (যদি তা হয়, হবে সবার জন্যেই)। যন্ত্রসভ্যতার লাভক্ষতিটা খতিয়ে দেখবার সুবিধে আমরা পেয়েছি। তার পরিশুদ্ধ রূপকে আমরা নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এ সুযোগ হয়ত আমরা গ্রহণ করব না! প্রতিপদেই আমাদের মনে হবে যাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি তার আগাগোড়াই বিদেশী ভারতীয় মহাসভ্যতার তাতে অপমান! গ্রীক হোরাশাস্ত্রের শরণ নিয়ে বরাহমিহির ভারতীয় সভ্যতাকে ত অপমানিতই করেছেন!

জীবন্মৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

(৪৩)

কোল, ওরাওঁ সাঁওতাল মেয়েদের দূরাগত কণ্ঠসঙ্গীত সুষমার মনে অনেক কিছু অবদমিত স্মৃতি আলোড়িত করে তুলতো। তখন পরবের সময়। আমেদের প্রবল উৎসাহ এড়াতে না পেরে সে সারা সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে বৃক্ষরোপণ উৎসব দেখে এলো। ছেলেমেয়েদের একত্রে নৃত্য, উন্মুক্ত আনন্দোচ্ছাস সুষমাকে বারংবার অশোকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। প্রথম দিনের সেই অতর্ক স্পর্শ থেকে সুরু করে সে যতবার অশোকের কাছে এসেছে ততবার শাসন করেছে নিজের হৃদয়কে, কিন্তু দূরে থেকে যখন সে-শাসনের কোন অর্থ রইলো না তখন সে ইচ্ছা করেই সবল সুস্থ পুরুষসুলভ অভিব্যক্তি দেখলে অশোককে স্মরণ করতো। তাই সেদিন সে সন্ধ্যার পর লোকালয় হতে কিছু দূরে গিয়ে অশোককে উদ্দেশ্য করেই অনেকগুলি গান গাইলো। আমেদ সঙ্গে ছিল। সে মুগ্ধ হয়ে শুনলো নারী কণ্ঠের সঙ্গীত কতখানি নিবিড় ও উদাত্ত হতে পারে। বনবনান্তর আর আকাশবাতাস ভরে উঠলো গানে গানে।

নালার জলের ওপর যেখানটা জ্যোৎস্নালোক এসে পড়েছিল সেখানে দুজনে বসেছিল দুটি উপল খণ্ডের ওপর। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সুষমা উঠে পড়তে আমেদ বললে—"যার এমন অদ্ভুত সুন্দর গলা সে কিনা জঙ্গলে পড়ে রয়েছে।"

সুষমা ম্লান হাসি হেসে বলতে যাচ্ছিল "ড্রইং রুমে—"

বাধা দিয়ে আমেদ বললে—"এ গলা জনসভার গলা, রাস্তার মিছিলের গলা, মজদুরদের মানুষের মত মানুষ করে তোলবার গলা—"

সুষমা হেসে বললে "গলা ছেড়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে গান গাওয়া ছিল আমাদের গুরুদেবের আদেশ কিন্তু তিনি গ্রামোফোন কিংবা লাউড্‌স্পীকার ভালবাসতেন না—"

আমেদ বললে "আপনাকে গ্রামোফোন কিম্বা লাউড্‌স্পিকারের কাজ করতে বলছি না—স্পেনের পাসিওনারিয়ার নাম শুনেছেন? তাঁর মত করে নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য্য দিয়ে দুর্ব্বলকে সবল করে তুলুন, নৈরাশ্যের মধ্যে ভরসার সৃষ্টি করুন—দাবানলের মত জ্বালিয়ে দিন যত জঞ্জাল আর গ্লানি। গাছ-পালা আর শূন্য আকাশের মধ্যে কথা আর সুরের ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে কি হবে?"

সুষমা এবার কোন কথা বললো না। দুজনে নালার ধারে ধারে পায়ে চলা পথ ধরে চলেছিল, শ্মশান দেখা গেলো। দুজনেই এক প্রান্তে একটি বড় তাঁবু দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলো। এগিয়ে গিয়ে দেখলো বন্ধ। ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। একপাশে অবিরল ঘনবদ্ধ শাল জঙ্গল আর অন্য পাশ ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর—চাঁদের আলোকে আপ্লুত। রাত্রে কখনও সুষমা এদিকে আসেনি সঙ্গীর অভাবে। আমেদ বললে "এত কাছে অতিথিশালা থাকতে শ্মশানের পাশে কে তাঁবু ফেলতে যাবে বুঝতে পারছি না,—এদিকে, পর্শু এসেছি কিন্তু তখনও কিছু দেখিনি।"

কিছু দূরে নারভানীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন—"তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম—যতক্ষণ গান হচ্ছিল ততক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলাম তারপর ভাবলাম কাছাকাছি পাগল ছাড়া আছে—তাদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বিভ্রাট না বাধিয়ে বস।"

"তাঁবুতে? কারা? ভাওলেন্ট নাকি?"

"অত্যন্ত নিরীহ, পরিচয় দিল মা আর ছেলে বলে। ছেলেটির বদ্ধধারণা হয়েছে যে সে হচ্ছে বাংলার এপ্‌ষ্টাইন। বাতিক হচ্ছে শ্মশানে শ্মশানে মূর্ত্তি গড়া। মা সঙ্গে এসেছে। কিছু দূরে থেকে চিকিৎসা করাতে চায়। লোকালয়ের কাছে থাকলে শ্রীমান নাকি ক্ষেপে যান।"

"কিন্তু কাউকে ত' দেখতে পেলাম না—"

"তাহলে বোধ হয় হিন্দুলবনের হাটে গেছে—পাগল মানুষ যেখানে হোক কাটিয়ে দেবে রাত্তিরটা। কালকে দেখতে পাবে—"

"কাল ত' ভোরে উঠেই পালাচ্ছি এখান থেকে—"

সুষমা আর নারভানী সমস্বরে বললে "সে কি কথা—"

"দিদির কাছ থেকে হুকুম এসেছে, আজ সকালে যাবার কথা ছিল কিন্তু চিঠি পেলাম বিকেলে—তারপর আর বলবার সময় পেলাম কোথায় আর তাছাড়া এমন কি জাঁকজমক ব্যাপার যে নোটিস্ দিতে হবে।"

সুষমা জিজ্ঞাসা করলে "আবার কবে আসছেন ?"

"আর আসছি না। সমবায় কারখানার আকাশকুসুম এমনভাবে শুকিয়ে গেছে যে অতি বড় উন্মাদও কল্পনায় পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। এবার আমার ঘাড়ে পড়েছে চটকলের কাজ।"

সুষমা বেদনা বোধ করলো গভীরভাবে। নিজেকে এতখানি নিশ্চিহ্ন করে সমাজ সেবায় জীবন উৎসর্গ করায় সার্থকতা থাকতে পারে, সে কথা স্বীকার করেও আমেদের এই অনিশ্চিত কর্ম্মজীবন অনুমোদন করতে পারতো না সে। দিদিভক্তির এতখানি আতিশয্যও তার কাছে পীড়াদায়ক হতো, অথচ মহিলাটিকে ভাল করে জানবার কৌতূহলের অবধি ছিল না। চেষ্টা করলে সে কৌতূহল এবার আমেদের সঙ্গে গিয়েই হয়ত' চরিতার্থ করতে পারতো কিন্তু সংকোচ এড়াবার শক্তি ছিল না। যখন মনে পড়ে যে আড়াল থেকে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বিদায় করে দিয়েছিল যাকে সেই পরিচারিকা আর আমেদের দিদি হচ্ছে একই লোক তখন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। তা ছাড়া শেষের দিকে প্রতি ছুটিতে গিয়ে যাকে দেখেছে সে যতই আড়ালে আড়ালে থাকুক না কেন, যতই মূক ও বধির সেজে থাকুক না কেন, তার মুখখানা পর্য্যন্ত স্মরণে আনতে না পারায় নিজের শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যকে ধিক্কার না করে পারে না। আমেদই একদিন তর্কের মধ্যে বলেছিল যে কলকাতার মধ্যবিত্ত ও ধনীশ্রেণীর অধিকাংশ পুরুষমানুষ তাঁদের পরিচারকবর্গের ব্যক্তিগত জীবন থাকতে পারে বলে কল্পনাই করতে পারে না। সেদিন সে সাহস করে স্বীকার করতে পারে নি যে স্ত্রীলোক হয়েও সে নিজেদের পরিচারিকাকে চেনে নি।

পরদিন সকালে আমেদ যখন সত্য সত্যই যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে বাসে উঠে বসলো তখন সুষমা বুঝতে পারলো কতখানি শূন্য সে ভরাট করেছিল এতদিন। পূর্ব্বের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে হৃদয়কে মিলিত করে তোলা দুরূহ হয়ে উঠলো। এ প্রদেশে ঋতুর প্রকৃতি কিছু উগ্র। গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীতের মাঝের ঋতুগুলিরও রূপ স্পষ্ট আর তারই একটির প্রভাব ছুলিয়ে দিয়েছিল সুষমার মন। আমেদের প্রচুর প্রাণশক্তি নানাভাবে তাকে আবিষ্ট করেছিল। সে চলে যাবার পর ধর্ম্মকথার চেয়ে হাটের কোলাহল আর গ্রামবাসীদের পরবের আনন্দ সুষমার কাছে অধিক প্রিয় হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ নারভানী একদিন অপরাহ্নে ফিরে এসে তার অন্যমনা শূন্য দৃষ্টি দেখে বললেন "পাগলেতে কেমন সুন্দর হাতের কাজ করতে পারে দেখতে চাও ত' চলো।"

গৃহকর্ত্রীর কাছে ছুটি নিয়ে সুষমা একটি রঙিন শাড়ী পরে এলো আর বাগান থেকে তুলে মাথায় গুঁজলো ফুল। বৃদ্ধ খুব খুশী হয়ে উঠলেন। সমবায় কারখানার পরিকল্পনাটি পলিটিকাল অফিসারের একটি কলমের খোঁচায় ঘায়েল হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অনেকগুলি আবশ্যক ও অনাবশ্যক কাজ চাপিয়েছিলেন নিজের ঘাড়ে। আজ একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আশাতীত ভাবে সফল হওয়ায় তাঁর চিত্ত প্রফুল্ল ছিল।

পথপ্রান্তের উদ্ভিদ্, মাটি, পাথর সব কিছুর গবেষণা করতে করতে তাঁরা হঠাৎ এসে পড়লেন শ্মশানের মধ্যে। সুষমা বিস্মিত হয়ে দেখলো যে একজন ক্ষীণদৃষ্টি যুবক ছেনি ও হাতুড়ির সাহায্যে একটি মূর্ত্তি গঠন করছে আর অনতিদূরে বসে আছে শুভ্রবেশী এক নারী—মধ্যবয়সী ও কৃশকায়া।

রমণী বৃদ্ধকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। সুষমার মনে হলো মুখখানি পরিচিত কিন্তু কোথায় দেখেছে স্মরণে আনতে পারলো না। তার প্রতি এক মুহূর্ত্ত পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমণীটি বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে মাথা নত করে বললেন "আপনার কাছে আর একটি আবদার আছে—আপনাকে আরও কিছু পাথর আনবার জন্যে লরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে—"

"বেশ ত' কিন্তু কোথায় সেই নক্শা—আমাদের মেয়েকে নিয়ে এসেছি দেখাতে।"

যুবকটি আপন মনে কাজ করে চলেছিল। আগন্তুকদের প্রতি চেয়েও দেখলো না। তার স্কন্ধে লটকানো ঝাভার থাক হতে একখানি বড় নক্সা-কাগজ বার করে রমণীটি সুষমার হাতে দিলেন।

সুষমা দাঁড়িয়েছিল, বসলো গাছের গুঁড়ির ওপর। এ প্রতিকৃতি যে তার পিতার সে-বিষয়ে তার কোন সন্দেহ রইলো না। নারভানীর চেনবার কথা নয় কারণ তিনি নিশিকান্তকে শেষ অবস্থায় দেখেছেন। সুষমা অনেকক্ষণ দেখলো। দেখে নিজের হাতেই যথাস্থানে রেখে দিল। রমণীটি যে কে তাও সে বুঝলো কিন্তু প্রকাশ করলো না। কারাবাসের কষ্টে শরীর অনেকখানি শুখিয়ে গেলেও চেহারার বিশেষ কোন বিকৃতি হয় নি।

নারভানী যখন বিদায় নিলেন তখন সুষমা তাঁকে বিস্মিত করে রমণীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো।

(৪৪)

পাঁচুগোপাল বাবুর অর্থ স্বোপার্জ্জিত। চাকুরি জীবনে তিনি যে সরকারী তরণীর কর্ণধার ছিলেন তা'তে স্বয়ং মালক্ষ্মী পদার্পণ করে কাষ্ঠকে স্বর্বর্ণে পরিণত করেন এই রকম কিংবদন্তী শোনা যায়। দুষ্টলোকে আবগারি বিভাগের এক কলঙ্কের সঙ্গে তাঁর নাম সংশ্লিষ্ট করতো বটে কিন্তু তার কোন প্রমাণ ছিল না। তা ছাড়া সে ছিল প্রাক্ ঐতিহাসিক ব্যাপার। যাই হোক অর্থ অর্জ্জন করা যত সহজ রক্ষা করা তত সহজ নয়। পাঁচুগোপাল বাবুর বাহাদুরি যে তিনি তেজারতি কারবারে খাটিয়ে সেই অর্জ্জিত অর্থ দ্বিগুণিত করতে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁর দুর্নাম যতই রটুক না কেন কলিকাতা সহরে এমন কোন জনহিতকর সমিতি ছিল না যার কার্য্যকরী সভা অলঙ্কৃত করেন নি তিনি। প্রমদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার সময় তিনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন নি। স্বয়ং উপযাচক হয়ে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন একটি বিশেষ কারণে। মহিলা সমবায় বীমা কম্পানীর পরিকল্পনা বহুদিন থেকে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং প্রমদার কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তারই সাহায্যে কর্ম্মীবৃন্দ গঠন করবার মতলবে ছিলেন। বাহিরের শিথিল ও বিশৃঙ্খল ভাব ইচ্ছাকৃত অভ্যাসের দ্বারা অবলম্বন করেছিলেন নতুবা তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস না হয়ে অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছিল।

প্রমদার দাম্পত্যজীবন অভিশপ্ত দেখে তাঁর হৃদয় জীর্ণ হয়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে উনি তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বিভূতিকে এতখানি বাড়াবাড়ি অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত করেনি প্রমদা কিন্তু একবার একটা সঙ্কল্প মাথায় ঢুকলে অর্দ্ধসমাপ্ত রাখা তার অভ্যাস নয়। সেইদিন থেকেই কম্পানীর পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ হতে চললো।

একটীর আওতায় আর একটি কল্পনা-বল্লরী প্রমদার মানস-নিকুঞ্জে অঙ্কুরিত হলো অত্যন্ত সন্তর্পণে। পাঁচুগোপাল বাবুর স্কন্ধারূঢ় হয়ে ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকে পড়লে কেমন হয় ? একে স্ত্রীলোক তার ওপর নমশূদ্র জাতির প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ালে কার সাধ্য পথরোধ করে।

বিভূতি সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে বৃদ্ধের মুণ্ডপাত করবে প্রতিজ্ঞা করে অতি প্রত্যুষেই ধাবিত হলো। প্রমদাও সারা রাত্রি জেগে খসড়ার পর খসড়া লিখে শেষেরটি নিয়ে টাইপ-মুদ্রিত করতে দিতে বেরিয়েছে এমন সময় গেটের কাছে উভয়ের সাক্ষাৎ। বৃদ্ধ তখন নিদ্রিত। ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত তীব্রভাবে ফোঁস করে উঠে প্রমদা বললে যে সে যদি তার এক পা অগ্রসর হয় কিম্বা বৃদ্ধকে অনুমাত্র বিরক্ত করে তাহলে রাজপথের মাঝে দাঁড়িয়ে মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করে ছাড়বে। বিভূতিকে হতবুদ্ধি হয়ে ফিরতে হলো। তারপর সে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে অস্ট্রিচের মত নিজের লজ্জা নিবারণ করেছে আর সেই সঙ্গে বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

অবশেষে একদিন প্রমদা সদল বলে এসে উৎসবের হুল্লোড় লাগিয়ে দিল। ক্রোধে দুঃখে মুহ্যমান বিভূতি শুনলো যে পিয়ারসান কলেজের নূতন অধ্যক্ষ সরকারী কার্য্যে ইস্তাফা দিয়ে দেশসেবায় অবতীর্ণ হচ্ছে বলে সহরময় রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে।

নব প্রতিষ্ঠিত বীমা কম্পানীর মহিলা সম্পাদক অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে প্রকাশ করলো যে যে-কল্পনা হতে পঙ্গু উদ্ধার করবে বলে কাজে নেমেছিল সে, তার কোন তল নাই। তার চেয়ে কবির কল্পনা "আকাশ তলে উঠল ফুটে আলোর শতদল"কে সে সার্থক করে তুলবে একশত নারীর হৃদয় কমল দিয়ে।

একশত নারী অংশীদার নিয়ে বীমা কম্পানী গঠন করে প্রমদা। তারপর সহস্রদলের জন্য আহ্বান জানিয়ে দিল জ্বালাময় ভাষায়—বললে,"এতকাল পুরুষের প্রভুত্বে যদি জাতির অকল্যাণ হয়ে থাকে তাহলে নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ভিন্ন আত্মনির্ভরতার কোন উপায় নেই।"

পাঁচুগোপাল বাবু ভাল করেই জানতেন যে নিছক কথা ও সাময়িক উত্তেজনায় আহুত অর্থের দ্বারা ব্যবসার বনিয়াদ পাকা হয় না। তিনি প্রমদাকে উপদেশ দিলেন যে গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে অসংখ্য মহিলা সমিতি গঠন করে, এই কথারই প্রতিধ্বনি তোলা চাই যে মায়ের জাতি উন্নত না হলে দেশ উদ্ধারের পরিকল্পনা বৃথা।

দেখতে দেখতে কম্পানীর মূলধন অন্যান্য সাধারণ প্রতিযোগীর শীর্ষে উঠলো এবং সেই অর্থের বলে পাঁচুগোপাল বাবু একটি ক্ষমতাশালী সংবাদপত্রকে করায়ত্ত করে ফেললেন।

সুদূর পল্লীগ্রামের গৃহলক্ষ্মীদের অঙ্গের অলঙ্কারের বিনিময়ে শেয়ার বিলি হলো। অংশীদারদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। মণিঅর্ডারের সঙ্গে আসে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অবান্তর কথা, অশিক্ষিতাদের অপত্য স্নেহের ব্যঞ্জনা, আতঙ্ক। এই সকল আবর্জ্জনা ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে প্রমদার কার্য্য লাঘব করবার জন্যে মোতায়েন রাখা ছিল দু'জন পুরুষ কেরাণী।

উদ্বোধন উৎসবের পার্টিতে বিভূতি নিমন্ত্রিত হলো না। কেশ বিন্যাস করবার সময় অনেক ভণিতা করে প্রমদা বলে "এত বড় সোমত্ত মেয়ে বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ডুব মেরে চম্পাকলীর মত জঙ্গলী জায়গায় গেল কেন সেই নিয়ে সমাজে রীতিমত জল্পনা কল্পনা চলেছে। তুমি বাপু এই সব পার্টি ফার্টিতে যেও না। রগ-চটা মানুষ কখন কি কথা শুনে কাকে অপমান করে বসবে—"

"তার মানে ?"

"নাইবা শুনলে—বংশের ধারা বদল হবে কেমন করে বল—"

বিভূতি লাফিয়ে উঠে পুনর্ব্বার বসে পড়লো। প্রমদা একটি খদ্দরের শাড়ীকে তখন বাগ মানাতে ব্যস্ত। ক্ষণিকের আস্ফালন গ্রাহ্যই করলে না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে চললো "লোকেরা কুৎসা রটাতে পারলে ছাড়বে কেন, সেই জন্যেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল—"

"তার মানে ?"

"লোকেরা বলে এতখানি বাড়াবাড়ি রকমের দরদের অর্থ হয় না—হিন্দু আইনে বড় ভায়ের সম্পত্তি পাবার কথা তোমার আর তুমি কিনা একটা মেয়ের হাতে সব ছেড়ে নিশ্চিন্ত রইলে ?"

"বারে,—দাদার ত' উইল করা ছিল।"

"হলেই বা—ও মেয়ে তোমার দাদার তারই বা কি প্রমাণ আছে—ও যে প্রভাতদার—"

বিভূতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। এই প্রথম সে স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলো।

ক্রমশঃ

"মন্দিরা" দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র

দেশের বর্ত্তমান অবর্ণনীয় দুরবস্থায় 'মন্দিরা'র তরফ হইতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া ২৬।১ নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়াছি। এখানে প্রত্যহ পাড়ার প্রতি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে এক পোয়া দুগ্ধ ও একখানা পাউরুটী বিনা-মূল্যে দেওয়া হয়। যে সব পরিবারের আয় মাসিক ৪০৲ টাকার নিচে ও ৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু যাঁহাদের আছে তাঁহাদেরই এখান হইতে দুধ ও পাউরুটী দেওয়া হয়। যে সব পরিবারে একটির অধিক শিশু আছে তাহাদের ।০ সের দুধ দেওয়া হয়।

এইরূপ একটি কেন্দ্র পরিচালিত করিতে মাসিক প্রায় ৩৫০৲ টাকা ব্যয় হয়। "মন্দিরা"র গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের এই কার্যে সহায়তা করিলে আমরা এইরূপ আরো কয়েকটি কেন্দ্র খুলিতে পারি।

কমিটি

সভাপতি—শ্রীমতী স্নেহলতা সেন
সম্পাদিকা—শ্রীমতী রেবা ঘোষ
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিমল মজুমদার

সভ্যগণ ঃ

১। শ্রীমতী প্রভা বসু
২। শ্রীমতী ধীরা বসু
৩। শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা
৪। শ্রীমতী আরতি রায়
৫। শ্রীসুধীর বসু
(১নং কেন্দ্র পরিচালক)
৬। শ্রীএম. এস. কৃষ্ণাণ
৭। শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায়

আমাদের এই জনহিতকর অনুষ্ঠানে আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাহায্য "মন্দিরা" কার্য্যালয়ে গৃহীত হইবে।

"মন্দিরা কার্য্যালয়"
৩২, অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।

শ্রীমতী রেবা ঘোষ
সম্পাদিকা।

কি লিখি—

শ্রীবিমল ঘোষ

কি লিখি তাই ভাবনা বেজায়—একটু সময় নেই।
গল্প-গাথা, হাসির কথা—লিখতে বসি যেই।
অমনি দেখি চোখের পরে ভাসছে তাদের মুখ
ক্ষুধায় যারা কাতরে কাঁদে— দুঃখে ফাটে বুক।
ধুঁকছে যারা, মরছে যারা—পায়না যারা খেতে
তারাই যেন ডাকছে আমায়, ডাকছে দিনে রেতে।
পত্রিকাতে চাকরী করে ভিক্ষা যাহা পাই
তার থেকে ভাগ ওদের দিয়েও—শান্তি নাহি ছাই!
জাতীয়তার অশ্রুজলে জাগায় যাদের ব্যাথা
তারাও দেখি চুপ করে আজ, কয়না কোনও কথা।
দেশের জ্ঞানী, দেশের গুণী তারাও দেখি সবে
কাজ করে যায় কলের মত দিব্যি নীরব রবে।
ধনীরা সব টাকার অঙ্কে বাড়িয়ে তোলে পুঁজি
বাঙালী প্রাণ হারায় কেন? দেখছেনা কেউ খুঁজি।
কাগজওলা টাকার জোরে—লেখকদলে দলি
বলে 'মশাই' লিখুন তেমন, যেমন আমি বলি।
এ দম্ভও সয়ে আছি আমরা লেখক কবি
আমরা দোব দেশকে বলো—কোন সে মহান ছবি?
এমনি ধারা কতই কথা, ভাবছি কলম হাতে
চোখের জলের পড়ছে ফোঁটা—শুভ্র খাতার পাতে।
এমন সময় হঠাৎ দেখি উঠলো কলম কেঁপে
কালির টানে রুদ্ধ বেদন শুভ্র-সাগর ফেঁপে—
গর্জ্জি বলে—'বাঁচতে হবে বাঁচার মত বাঁচা
পাখীর মত মুক্ত হতে—ভাঙনা শেকল খাঁচা।
দয়ার দান ঐ ছাতু-ছোলায় ভরবে না পেট ওরে
পরের বলা কপ্‌চে বুলি—চেঁচাস্‌নি আর জোরে।'
থামলো লেখা এইখানেতেই—নিভ্‌লো ঘরের বাতি
লেখার সময় নয়কো এখন—নামলো নিকষ রাতি।

———

মেঘের কোথা ঠাঁই

অঞ্জলি সরকার

শ্রাবণ-মেঘ এসেছে ভেসে
বারিদানের গোপন বেশে
বজ্র বেঁধে বুকে
তাইতো আর নভের আঁখি
আমার হাতে বাঁধে না রাঁখি
চপল কৌতুকে।

নীলের আভা একটুখানি
দেয় না খুলে আঁচল টানি
নিশীথ স্বপনেতে
আজকে তাই আমার মাঝে
হাহাকারের বিষাণ বাজে
ক্ষুব্ধ হৃদয়েতে।

অনেক বাধা, তবুও জানি
আনবো ডেকে আলোর বাণী
ঝঞ্ঝা দিয়ে শেষে—
ধরার বুকে সেদিন নেমে
বাজবে বীণ গভীর প্রেমে
শেফালিকায় হেসে।

তাইতো এই চরম দিনে
ছলের খেলা নিলাম চিনে
গভীর বেদনায়
রইনু বসে শ্রাবণ কোলে
দেখবো আমি আকাশ তলে—
মেঘের কোথা ঠাঁই।

———

সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাস

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে ভুল বোঝবার অবকাশ সুপ্রচুর। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক এর ভুল ব্যাখ্যা করবার লোকের অভাব কোনওদিনই হয়নি। শিক্ষার অভাবে এদেশের জনসাধারণের মনে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অসুসন্ধিৎসা অল্পই। সুতরাং তাদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর সমর্থক কতগুলি মনগড়া ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে তাদের নিকট খুবই উপভোগ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের বিরাট জনসংখ্যা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি ধর্ম্মে বিভক্ত—অন্যান্য খুঁটিনাটির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ভারতবর্ষের যে বিশিষ্ট সংস্কৃতি তাও প্রধানতঃ এই দুই ধর্ম্মকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে—একথাও সকলেই মানেন। কিন্তু মুস্কিল হয় সংস্কৃতির টীকাকারদের নিয়েই। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যে এক, অখণ্ড, এই সহজ সত্যটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না—ম্যাক্সমুলার কল্পনা করেন আর্য্য জাতির ও আর্য্য সংস্কৃতির। আধুনিকালে জিন্নাসাহেব স্বপ্ন দেখেন মুসলমান জাতির ও মুসলিম সংস্কৃতির। "বিশুদ্ধ" আর্য্য জাতি ও "বিশুদ্ধ" মুসলিম জাতি—এ দুটি পরিকল্পনার সত্যাসত্য বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখবার অবকাশ আর ঘটে ওঠেনা। সুবিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ম্যারেট এক জায়গায় বলেছেন—"The old ideas about race as something hard and fast for all time are distinctly on the decline. Plasticity or, in other words, the power of adaptation to evnironment, has to be admitted to a greater share in the moulding of mind and even of body than ever before." * তথাকথিত "বিশুদ্ধির" প্রত্যয়কে বিজ্ঞানীরা যে আজ আমল দিচ্ছেন না উক্তিটি তার প্রমাণ। সুতরাং ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান বলে দুটি আলাদা জাতি ও সংস্কৃতি বর্ত্তমান এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাদের এই পার্থক্যটাকেই চিরন্তন বলে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন এ ধরণের যুক্তিটা আর-যাই হোক বৈজ্ঞানিক কিনা সন্দেহ। আজ প্রায় ৮০০ বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান ভারতে পাশাপাশি বাস করছে—এতেও কি তাদের "বিশুদ্ধি" বজায় রয়েছে?

নৃতত্ত্ববিদেরা ভারতবর্ষের বিরাট জনসংখ্যার ভিতর নৃতত্ত্ব সম্মত সাতটি বিভাগ দেখতে পেয়েছেন—যার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি এখানে দেওয়া গেল—দ্রাবিড়ীয় (আবাসভূমি প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্য), আর্য্য বা Indo Aryan (আবাসভূমি কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজপুতনা), তুর্ক-ইরাণীয় ও আফগান (আবাসভূমি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—বালুচিস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশের কতকাংশ), শক-দ্রাবিড়ীয় বা Scytho Dravidian (আবাসভূমি—সিন্ধু, বোম্বাই প্রদেশ), আর্য্য-দ্রাবিড়ীয়, (আবাসভূমি-পূর্ব্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহার), মঙ্গোলীয় (আবাসভূমি—ব্রহ্মদেশ, আসাম, ভুটান, নেপাল, যুক্তপ্রদেশের উত্তর সীমান্ত, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কিয়দংশ) এবং মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয় † (আবাস-ভূমি বাংলা দেশ ও উড়িষ্যা)। এককালে দ্রাবিড়দের ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী বলে ধরা হ'ত। ক্রমশঃ ভারতবাসীর মধ্যে প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় একটি স্তরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'তে আরম্ভ করেছে। এরাই সম্ভবতঃ ছিল ভারতবর্ষের আদিমতম অধিবাসী। আধুনিক উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের শবর, কোল, মধ্যভারত ও রাজপুতনার ভীল, কৌল, মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতিরা এই প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় স্তরের প্রতিনিধি। নৃতত্ত্বের খুঁটিনাটির

* * Anthropology (London 1914) pp 92-93

† শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ একথা স্বীকার করেন না—তাঁর The Indo Aryan Races নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কিন্তু এসব খুঁটিনাটি বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় নয়।

কথা ছেড়ে দিয়ে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে—যে বর্ত্তমান ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপর প্রধানতঃ তিনটি ভাষার প্রভাব রয়েছে—এবং তা হল যথাক্রমে **অষ্ট্রিক**, দ্রাবিড় ও আর্য্য। জাতিতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব এই তিন তত্ত্বের বিচারে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রভাবগুলি দেখা যাচ্ছে।

১। **আদিতম নেগ্রিটো প্রভাব**। কালক্রমে এদের অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্নই এখন প্রায় লুপ্ত। তবে আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে দক্ষিণ-ভারতের দু'একটি বন্য জাতির মধ্যে এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থানে এদের অস্তিত্বের নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। এদের সভ্যতা খুব উঁচুদরের ছিলনা।

২। **অষ্ট্রিক**। এই জাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষে আগমন করে ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব থেকে এবং সঙ্গে নিয়ে আসে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সভ্যতা। ভারতের স্থানীয় নেগ্রিটোরা অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর সংস্কৃতি তাদের ঘাড়ে চাপাতে এরা দ্বিধা করলনা। ফলে নেগ্রিটোরা বিজিত হ'য়ে চলে গেল অবলুপ্তির পথে। নেগ্রিটো ও অষ্ট্রিক রক্তের সংমিশ্রণে কোল বা মুণ্ডা জাতির উদ্ভব হ'য়েছে কেউ কেউ এরকম অনুমান করেছেন। যাক্ ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন অষ্ট্রিকরাই করে।

৩। **দ্রাবিড়**। এদের আগমন হয় উত্তর পশ্চিম থেকে। অন্ততঃ বর্ত্তমানে এই মত মেনে নেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। এরাও সঙ্গে নিয়ে আসে একটি উঁচুদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় এই দুই শক্তিশালী সভ্যতার সংঘাতে—উভয়ের একটি বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটে।

৪। **আর্য্য ভাষা-ভাষীগণ**। বিরাট বৈদিকসভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা এই আর্য্যভাষাভাষীদের অভিযান এসেছিল খুব সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম থেকে। এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এঁরা বাহুবলের সাহায্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন নেগ্রিটো-অষ্ট্রিক দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে এঁরা আপনাদের বহুকথিত "বিশুদ্ধি" বজায় রাখিতে পারলেন না। তথাকথিত আর্য্যসভ্যতার বিশ্লেষণেই এই সত্য ধরা পড়ে।

৫। এর পরেও "মঙ্গোলীয়" জাতির আগমন ভারতে ঘটেছে এবং তা উত্তরপূর্ব্ব থেকে। সুতরাং মঙ্গোলীয় প্রভাবও এসে মিশ্‌ল পূর্ব্বতন মিশ্র সভ্যতায়।[১]

তাহ'লে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ালো? জন্মে ইস্তক শুনে আসছি আমাদের সনাতন হিন্দু বা আর্য্য সভ্যতার জয়গান—ম্যাক্সমূলার থেকে সুরু করে বহু চুনোপুঁটি ভাবে গদ্গদ হয়ে পড়েন এর মহিমাকীর্ত্তনে, তার বিশুদ্ধিটা বজায় থাকলো কই? দেখা যাচ্ছে প্রাক্‌মুসলমান যুগে যাকে আমরা হিন্দু সভ্যতা বলে গৌরব দান করে থাকি তা কোনও বিশুদ্ধরক্ত জাতির সৃষ্ট নয়—নেগ্রিটো অষ্ট্রিক দ্রাবিড় আর্য্য ও মঙ্গোলীয় প্রভাব তাতে মিশে আছে ওতপ্রোত ভাবে, পৃথক করবার উপায় নেই। উপরি উক্ত প্রভাবগুলি ছাড়াও শককুষাণ যুগের বৈদেশিক প্রভাবের আমদানীও কিছু হয়েছিল সন্দেহ নেই। সুতরাং আজকে যে মুসলিম-লীগ-নেতা তার স্বরে ঘোষণা করেছেন হিন্দুরা কোনও কালে একটি জাতি বা single race ছিল না তাঁর উক্তি কিছুমাত্র অসত্য নয়। অষ্ট্রিক ভাষাভাষীরা ভারতে সর্ব্বপ্রথম "সঙ্ঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন" করে একটি লক্ষণীয় সভ্যতার সৃষ্টি করে। বর্ত্তমান ভারতে প্রচলিত আর্য্য (Indo Aryan) ভাষাগুলির মধ্যে অষ্ট্রিক ভাষার বহু উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ফরাসী পণ্ডিত প্যসিলুস্কি, ব্লক, ও লেভি রচিত প্রবন্ধের ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী কৃত ইংরেজী অনুবাদ Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ডাঃ বাগচী ও ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার বিশাল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার জন্য আমরা হ'য়তো দ্রাবিড়দের কাছে ঋণী। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের—সাহিত্যের ও ঐতিহ্যের অনেকটাই দ্রাবিড়দের দান। অপরপক্ষে—আর্য্যভাষাভাষীদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিও দ্রাবিড়ীয়রা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছিল। এখনও তথাকথিত আর্য্যধর্ম্ম দ্রাবিড়দের দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এই বিবর্ত্তনের ফলে গড়ে ওঠা এই মিশ্রসভ্যতার বনিয়াদ আরও পাকা হ'ল মঙ্গোলীয় ও শককুষাণ যুগের স্থীয় প্রভাবে।

১। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' থেকে এই বিবরণটি নেওয়া।

বিশুদ্ধ আর্য্যসভ্যতা বলে কোনও কিছুর কল্পনা করাটা তাহ'লে নেহাতই কল্পনা। এমনকি ম্যাক্সমূলার সাহেব পর্য্যন্ত শেষে বিজ্ঞানীদের সংপরামর্শ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি বলে কোনও কিছুর প্রত্যয়কে অস্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। অবশ্য গায়ের তলাকার মাটি সরে গেছে লক্ষ্য না করেই চুনোপুঁটিদের কেউ কেউ এখনও বিশুদ্ধির পো ধরে আছেন। কিন্তু তা একান্তই অরণ্যে রোদন—বিজ্ঞানের অরণ্যে। আর তথাকথিত হিন্দু সভ্যতাকে একটী মিশ্র সভ্যতা ধরে নিলেও তার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'য়না পৃথিবীর ইতিহাসে সমান ভাবেই তা গৌরবের দাবী করতে পারে।

এবার ভারতীয় ইসলামের আলোচনায় আসা যাক। ইসলামের জন্ম আরব দেশের মরুভূমিতে। কিন্তু জন্মের পরে অল্পকালের মধ্যেই নূতন প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে এই ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর সর্ব্বত্র। ভারতবর্ষের দ্বারও খুলে গেল এদের অগ্রগতির সম্মুখে। ভারতে ইসলামের বিজয় অভিযান বা ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়। কিন্তু প্রথমতঃ প্রচারকদের উৎসাহে দ্বিতীয়তঃ প্রথমে আরব ও পরে তুর্ক ইরাণীয় ও আফগান আক্রমণকারীদের বাহুবলে ভারতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হল। এই ইতিহাসের প্রথম দিকটাতে অবশ্য আমরা দেখি বিজয়ী ও বিজেতার দ্বন্দ্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ফলে সুলতান মাহমুদের ন্যায় সুশাসককেও দেখা যায় হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে ব্যাপারটার আর একটা দিকও ছিল—হিন্দু মন্দিরগুলি সাধারণতঃ প্রচুর ধনসম্পদের কেন্দ্র হওয়াতে আক্রমণকারীদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করত। তথাপি বলা চলে যে ভারতে ইসলামের প্রসারের যুগ—সত্যই দ্বন্দ্ব কলহ ও অশান্তির যুগ। তবে মূলতঃ এ দ্বন্দ্ব হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়—বিজেতা হিন্দু শাসক ও বিজয়ী মুসলমান শাসকের দ্বন্দ্ব।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। ভারতে নবাগত মুসলমানেরা কি কোনও একটি বিশিষ্ট জাতি বা raceএর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? ইতিহাস এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কারণ হিন্দু সভ্যতার ন্যায় ইসলামীয় সভ্যতাও একটি মিশ্র সভ্যতা (এখানে ইসলাম ধর্ম্মের কথা বলছি না)। আরব দেশে উদ্ভূত হ'লেও খাঁটি আরবী সভ্যতা এ নয়। প্রাক্‌ইসলামীয় পারসীক সভ্যতার প্রভাব এতে প্রচুর। তুর্ক প্রভাবও এর শিরায় শিরায়। চিন্তাধারার দিক থেকে গ্রীক্‌দের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। ভারতে ইসলামের আগমন হয় কয়েকটি স্তরে এবং আরব তুর্ক এবং আফগানেরা প্রথমে লুণ্ঠন ও পরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দলে দলে এসে সমাবেত হয় "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"। ভারতবর্ষে এসে এই ইসলামীয় মিশ্র সভ্যতা সম্মুখীন হল হিন্দু মিশ্র সভ্যতার। প্রথমে এ'ল সংঘর্ষের ও পরে সংগঠনের যুগ। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়ি তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে যায় যে হিন্দুমুসলমান এ'দুই সভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষে কেবল সংঘর্ষই বুঝি হয়েছে সংগঠন বা সমন্বয় হয় নি। কেবলমাত্র নবাগত মুসলমান অভিযানকারীদের দ্বারা ভারতীয় ইসলাম গঠিত হয় নি—ভারতে ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা অসংখ্য ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল। প্রাক্ ইসলাম যুগের মিশ্র হিন্দু সংস্কৃতি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে, স্থানে স্থানে লক্ষণীয় স্থানীয় বিশেষত্ব নিয়ে বিরাজ করছিল। এই সব স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেও—তাদের স্থানীয় হিন্দু সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য তারা পরিত্যাগ করল না। অপরপক্ষে বিদেশাগত মুসলমানেরাও ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে পুরুষানুক্রমে এদেশকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করলেন। আকবরের রাজত্বের পর থেকে—ভারতবর্ষ এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানেরই স্বদেশ বলে পরিগণিত হ'ল। এই ভাবে হিন্দু সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ে পথ পরিষ্কার হ'য়ে গেল—ও ফলে গড়ে উঠলো বিশাল ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতি যা আজও এক অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতি বলে পরিচিত। ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে—দেখা দিল বিচিত্র সুধী মতবাদ,রামানন্দ,কবীর, নানক, রবিদাস, চৈতন্য প্রভৃতির উদারনৈতিক দৃষ্টি-শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেল—ইসলামী রীতির অনাড়ম্বরতা ও হিন্দু-রীতির অলঙ্কারবহুলতা ও বিচিত্র কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়—ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে—উর্দ্দু নামক মনোরম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ! আজকে ভারতীয় হিন্দু বা ভারতীয় মুসলমান কেউই

বিচিত্র সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ নিজের বলে দাবী করতে পারেন না। এ সংস্কৃতি উভয় সম্প্রদায়ের যৌথসম্পত্তি এবং গৌরবের বস্তু। ভারতীয় মুসলমানকে আজ সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হ'বে—যে তিনি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও সংস্কৃতিতে ভারতীয়। ভারতীয় হিন্দুর পক্ষেও সেকথাই খাটে—তিনি ধর্ম্মে হিন্দু কিন্তু সংস্কৃতিতে ভারতীয়। ভারতীয় মুসলমানের এ কথা বোঝা প্রয়োজন যে তাঁর ভাষা তাঁর সাহিত্য তাঁর সংস্কৃতি, সমাজবিবর্ত্তন সব কিছুই সম্পূর্ণ ভারতীয়—আরব-দেশীয় বা তুরস্ক দেশীয় নয়। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বিদেশী ইসলামের গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করলে কিছু অন্যায় হ'বে না—কিন্তু সে গর্ব্ব যেন তাঁর ভারতীয়ত্বকে মুছে না ফেলে। কারণ এই বিদেশী মুসলমানদের চোখে তিনি মুসলমান বটে কিন্তু সমধর্ম্মিত্ব আর সমজাতীয়তা এক নয়।

আজকে ভারতব্যাপী যে একটা সুর কোনও ক্ষেত্র থেকে উঠছে—যে হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করে দেওয়া হোক—তাহ'লেই সাম্প্রদায়িকতার অবসান হ'বে এ মত অতি অসার। প্রথমতঃ দ্বিজাতির চোখে বিশুদ্ধ 'হিন্দু' বা বিশুদ্ধ 'মুসলমান' বলে কিছু নেই—দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে অবিমিশ্র হিন্দু সংস্কৃতি বা অবিমিশ্র মুসলমান সংস্কৃতি বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। এ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হ'লে—হ'য় ভারতবর্ষের মুসলমানদের জোর করে "মুসলমান ভারতে" বা পাকিস্থানে ঠেলতে হবে না হয় "হিন্দু ভারতে" মুসলমানের উপস্থিতি ও "মুসলমান ভারতে" হিন্দুদের উপস্থিতি-সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যাকে চিরতরে কায়েম করে রাখবে। তার উপর থাকবে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস হিংসা দ্বেষ ষোলোকলা পূর্ণ করতে। আর হিন্দু-মুসলমানকে জোর করে "পাকিস্থান" আর "নাপাকিস্থানে" চালান করা? ও সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল! বরিশালের মুসলমান চাষী পাঞ্জাবের যুদ্ধব্যবসায়ী পাঠান ও মাদ্রাজের তামিলভাষী মুসলমান ব্যবসায়ী এদের একত্র করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'বে—তা কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে! হিন্দুদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। তার উপর আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তো ওৎ পেতেই আছেন—ভেদনীতির এই চরম সাফল্যে তাঁরা যে কি পরিমাণ উল্লসিত হ'বেন তা অনায়াসে কল্পনা করা যেতে পারে।

তবে?—এইখানেই আজকের সমস্যা! একটা অনৈতিহাসিক অবৈজ্ঞানিক আত্মঘাতী আদর্শ আঁকড়ে ধরেই কি আমরা বসে থাকবো? তথাকথিত সাম্যবাদীদেরও যখন দেখি এই মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে নৃত্য করতে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন বিখ্যাত সাম্যবাদী শ্রীহীরেন মুখার্জ্জির লেখা "ভারতে জাতীয় আন্দোলন" নামক পুস্তিকা!) তখন সত্যই আশঙ্কা হয় যে পাকিস্থানী ব্যাধিটা রোগ হিসাবে মারাত্মক! আশার আলো যুগিয়েছেন জাপ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনদেশীয় মুসলমানেরা। এঁদের একজন খ্যাতনামা নেতা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত "এসিয়া" নামক পত্রে বলেছেন—"ভারতীয় মুসলমানের পক্ষ হইতে পাকিস্থান নামে যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের ধুয়া উঠিয়াছে টোকিও সাম্রাজ্যবাদিস্বলভ কূটচালের মধ্যদিয়া উহার গূঢ় রহস্য অবগত আছে বলিয়া চৈনিক মুসলমানেরা উহা কোনোমতেই সমর্থন করে না। চৈনিক জাতির সহিত চৈনিক মুসলমানদের বিচ্ছেদ ঘটাইবার মতলবে পাঁচ বৎসর হইতে জাপান এই কূটনৈতিক চাল চালিতেছে। তাহারা চৈনিক মুসলমানদিগের সম্মুখে "হুই হুই" অর্থাৎ স্বতন্ত্র চৈনিক মুসলিম রাষ্ট্রের টোপ ফেলিয়া আমাদিগকে তাহাতে আটকাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু খোদার অনুগ্রহে আমরা তাহাতে ধরা দেই নাই।.....মিঃার জিন্না যে পাকিস্থানের ধুয়া ধরিয়াছেন তাহার মূলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছু সারবস্তু আছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। যতদিন ভারতে বিচ্ছেদ ও অনৈক্য জিয়াইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে ইংরাজের প্রভুত্বও ততদিন সেথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মিঃ জিন্না ইংরাজ কূটনীতির ক্রীড়নক হইয়া পাকিস্থানের ধুয়া উঠাইয়া ভারত ও ভারতীয় মুসলমানদিগের গুরুতর অনিষ্ট করিতেছেন মাত্র।" (৩রা ভাদ্র, ১৩৫০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা কৃত অনুবাদ উক্ত পত্রিকা পৃঃ ৩) ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক!

সিসিলি অভিযান

শ্রীরেবা ঘোষ

ভূমধ্যসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ সিসিলি অভিযান বর্ত্তমান মহাসমরের এক নতুন পর্ব। এর আয়তন ১০ হাজার বর্গমাইল; অর্থাৎ ভারতবর্ষের উড়িষ্যা প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। য়ুরোপীয় ভূমিখণ্ড দখল করার প্রারম্ভিক পর্ব-সম্ভার বলা যেতে পারে একে, এবং সেই হিসেবে এর গুরুত্বও যথেষ্ট।

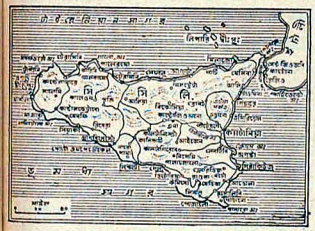

গোটা সিসিলি দ্বীপটী একটী ত্রিকোণাকৃতি ভূমিখণ্ডের মত। ইতালীর প্রধানতঃ চারিটি অংশ (১) দক্ষিণ আল্পস্, (২) লম্বডি উপত্যকা, (৩) আল্পাইন পর্ব্বত অধিষ্ঠিত উপদ্বীপাংশ এবং (৪) সিসিলি দ্বীপ। দক্ষিণতম ইতালীর সাথে সিসিলি দ্বীপ মেসিনা প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু এই প্রণালী মাত্র দুই মাইল চওড়া—যেমন জহোর প্রণালী দ্বারা সিঙ্গাপুর দক্ষিণ মালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। সিসিলির প্রধান বন্দর দুটী—মেসিনা ও প্যালারমো—বড় বড় পাহাড়, পাহাড়ের খাদ জলাভূমি ইত্যাদি দ্বারা সিসিলির স্বাভাবিক আত্মরক্ষার উপায়গুলি উৎকৃষ্ট।

সাধারণতঃ রণনীতি ও রণকৌশল বিচার করলে দেখা যায় যে সমুদ্রপারবর্তি দেশ আক্রমণের তিনটি স্তর আছে। অবতরণ অভিযান ও আক্রমণের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে তীরে উপস্থিত হওয়া এবং তীরভূমিতে সেতুমুখ বা পারঘাটা (bridge head) স্থাপনের মুহূর্ত। কোন বুদ্ধিমান সেনাপতিই আক্রমণকারীকে সমুদ্র পার হ'য়ে তীরে অবতরণ করতে কখনও দেবে না। যদিও বা অতর্কিতে অবতরণ সম্ভব হয়, তবুও সেতুমুখ স্থাপন চেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই। যদি আক্রমণকারী একবার কোন তীরভূমিতে অবতরণ করে এবং যথেষ্ট সৈন্য ও সামরিক শক্তি নিয়ে নিজে ঘাটি স্থাপন ক'রে শক্ত হয়ে বসতে পারে তবে তার পক্ষে অভ্যন্তর ভাগে অভিযান যেমন সহজ হয়ে ওঠে, তেমনই তাকে সাফল্যের সাথে বাধা দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সিসিলিতে এই রণ-নীতির বিপরীত পন্থাই চোখে পড়ে। সেখানে মার্কিণ, বৃটিশ ও কানাডীয় সৈন্যবাহিনী নির্বিঘ্নে অবতরণ ক'রে বিনা বাধায় অভিযান সুরু করে; এবং অতি দ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকে। অর্থাৎ সমুদ্র পারবর্ত্তী যুদ্ধের তিনটি স্তরই যেন একসঙ্গে অতি-ক্রান্ত হ'য়ে গেল। এ সত্যিই বিস্ময়ের।

১০ই জুলাই গভীর রাত্রে মার্কিণ জেনারেল আইসেন হাওয়ারের সর্বপ্রধান সেনাপতিত্বে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা সিসিলি দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্যাসিনায় প্রথম অভিযান সুরু করে। প্রথমতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু আগে বিমানবাহী ও গ্লাইডারবাহী সৈন্য অবতরণ করে। তারপর জাহাজযোগে পদাতিকদল এসে তীরভূমিতে উপস্থিত হয়। প্রকাশ যে, দু'হাজার ছোট বড় জলযান-এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। গত একমাস ধ'রে সিসিলির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যস্থানগুলিতে বোমা বর্ষণ করা হয়। তারপর অবতরণের মুখে নৌবহর, সৈন্যবাহী এরোপ্লেন, গ্লাইডার, প্যারাস্যুট, গোলন্দাজ, পদাতিক, বিবিধ প্রকারের বোমাবর্ষী বিমান ও

জঙ্গীবিমান এবং বিশেষভাবে তৈরী নৌকা ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে সিসিলির দক্ষিণ পূর্ব কোণ মাল্টা নৌঘাটির ৬০ মাইলের মধ্যে পৌছে প্রায় বিনা বাধায় অবতরণ করে। এবং দ্রুত অভিযান চালায়। বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যেরা অবতরণের ৪ দিনের মধ্যে উপকূলবর্তী সিরাকিউজ, অগস্তা, রাগুসা ও লিকার্তা প্রভৃতি অনেকগুলি বন্দর এবং বিমানঘাটি দখল করে। তারা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে এক্সিস সৈন্যগণকে ঘিরে ফেলবাব চেষ্টা করতে লাগলো! এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সেতুগুলো দিয়ে মিত্রপক্ষ ক্রমাগত সৈন্য ও সমরোপকরণ সরবরাহ করতে লাগলো। একদিকে মিত্রশক্তির তুলনায় ইতালীর বিমান সংখ্যা কম তদুপরি তাদের নৌবাহিনী পলাতক। এ অবস্থায় শক্তিমান মিত্র-বাহিনীকে প্রতিরোধ করার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে এলো। এই ভাবে সপ্তাহখানেক মধ্যেই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা দক্ষিণ পূর্ব সিসিলির ১০০ মাইল দীর্ঘ তীরভূমি ছেয়ে ফেলে। এবং ২০ মাইল অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে এই সময়ের মধ্যেই তারা গোলা এবং আরও রসদাদিসমেত দশটি বড় বড় বন্দর ও সহর দখল করে; অর্থাৎ এদ্বারা দক্ষিণ পূর্ব সিসিলির সমস্ত বিমানঘাটি ও বন্দরই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের দখলে আসে।

জেনারেল আইসেন হাওয়ার এ যুদ্ধের সর্বপ্রধান সেনাপতি হলেও, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মার্কিণ সৈন্যদের অধিনায়ক জেনারেল প্যাটণ এবং বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক সুপরিচিত জেনারেল মণ্ট্‌গোমারী এঁরা ব্যতীত নৌবহরের সর্বপ্রধান সেনাপতি হলেন এডমিরাল ক্যানিংহাম্‌। মোটামুটি ভাবে সিসিলির এই রণভূমিকে দুটি বড় বাহুতে ভাগ করা যায়। দক্ষিণ পশ্চিম বাহু ধরে মার্কিণ বাহিণী—এবং দক্ষিণ পূর্ব বাহু ধরে বৃটিশ ও কানাডীয় বাহিণী—অগ্রসর হতে লাগলো। মার্কিণ বাহিণী দক্ষিণ সিসিলির পশ্চিমাংশে গেল ও লিকার্তার দিকে এবং কানাডীয় সৈন্যেরা দক্ষিণ প্রান্তের কিঞ্চিৎ উত্তরে রগোলিনী হয়ে এবং পূর্বাংশে সিরাকিউজের দিকে বৃটিশ বাহিণী দ্বিতীয় বাহুর এই দুই দল প্যাসিলা থেকে ৫৫ মাইল দূরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। ঐ থেকেই বোঝা যায় যে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম তীর ধরে অগ্রসর হয় এবং এই দুই উপকূল ধরে আপাততঃ তারা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায়।

সিসিলির দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে তাদের এ প্রচেষ্ট অনেকাংশে সফল হলো। মিত্রপক্ষের এই দুই বড় বাহুর লক্ষ্য গোটা দক্ষিণ পূর্ব সিসিলির দুই প্রান্ত—প্রথমটি হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের আগরিগেণ্টো এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কাটানিয়া। এই দুইটি প্রধান শহর দখল করতে পারলেই দক্ষিণ পূর্ব সিসিলির দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান শেষ হবে। কারণ, এই অংশগুলি কেবল বিমান ঘাটি বা বন্দরের জন্যই সামরিক অভিযানের লক্ষ্যস্থল নয়, প্রকৃতপক্ষে রেলওয়ে এবং রাস্তার যোগাযোগের দিক থেকেও এই অংশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাটানিয়া, অগস্তা, সিরাকিউজ হয়ে রেল লাইন চলে গিয়েছে দক্ষিণতম সিসিলির ভেতর দিয়ে রাগুসা থেকে লিকার্তা পর্যন্ত এবং লিকার্তার পরে তা পার হ'য়ে আগরিগেণ্টো পর্যন্ত। বৃটিশ ও কানাডীয় সৈন্যেরা সিরাকিউজের পর অগস্তা ও রাগুসার গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ এবং মার্কিণ সৈন্যেরা লিকার্তা থেকে উত্তরবর্তী নারো সহরের রেলওয়ে জংসন দখল করল। এর সহজ অর্থ এই যে দক্ষিণ পশ্চিম তীরের আগরিগেণ্টো এবং দক্ষিণ পূর্ব তীরের কাটানিয়া মিত্রবাহিনী কর্তৃক বিপ… হতে চলেছে। জেনারেল মণ্ট্‌গোমারীর অধীন বৃটিশ সৈন্যের অগস্তা ছাড়িয়ে লেনটিনি দখল করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাটানিয়া বন্দরের বাইরের দিকে আঘাত-হানতে সুরু করে। এর পর দক্ষিণ সিসিলির চরম অধ্যায়—অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলে আগরিগেণ্টো ও পূর্ব উপকূলের কাটানিয়া সমতল ভূমির যুদ্ধ।

এই পর্যায়ে মিত্রপক্ষের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর ও ব্যাপকতর হতে লাগলো। ক্যালটাগিরোন, ক্যালটানিসেট্টা ও এন্না—এই সহরগুলিকে সিসিলির মধ্যবর্তী অংশের মধ্যে ধরা যেতে পারে। এন্না সহরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের দিক থেকে সিসিলির অভ্যন্তর ভাগের পক্ষে চাবিকাঠি স্বরূপ। অগ্রসরমান মিত্র-বাহিনীর গোলাগুলি ও কামানের পাল্লার মধ্যে এন্নার অবস্থা বিশেষভাবে সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠলো। মধ্যবর্তী সিসিলির এই সহরটি ছাড়াও ক্যালটানিসেটা সহর ইতিপূর্বেই মিত্রপক্ষের দখলে। আগরিগেণ্টো সহর কামান ও মেসিনগানের ঘাটিদ্বারা কিছুটা সুরক্ষিত ছিল সত্য, কিন্তু মার্কিণ সৈন্যদের প্রথম অধ্যায়ের আঘাতেই সেই ঘাটিগুলি ভেঙ্গে পড়লো।

মার্কিণ সাঁজোয়াবাহিণী বিমান বহরের সহায়তায় আগরিগেণ্টোর আত্মরক্ষার ঘাটিগুলিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে সহরের ভেতর প্রবেশ করতে সমর্থ হলো। অতঃপর ১৮ই জুলাই-এর সংবাদে খবর পাওয়া গেল যে আমেরিকান সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিম সিসিলির সর্বপ্রধান বন্দর ও নৌঘাটি এবং সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সহর আগরিগেণ্টো দখল ক'রে নিয়েছে। এর পর এই উপকূলে আর কোন তেমন উল্লেখযোগ্য সহর বা ঘাঁটি রইল না।

এদিকে পূর্ব উপকূলের অবস্থাও হিটলার মুসোলিনীর পক্ষে কিছুমাত্র সুখকর বলে মনে হয় না। এই উপকূলের চাবিকাঠি হচ্ছে কাটানিয়া বন্দর ও সহর। মণ্ট্‌গোমারীর সৈন্যেরা অগস্তাবন্দর দখলের পর কাটানিয়া প্রদেশের নদী ও প্রান্তর অনায়াসে ডিঙ্গিয়ে গেল এবং রোজই প্রায় কয়েক মাইল ক'রে এগিয়ে গিয়ে একেবারে কাটানিয়ার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলো। ক্রমে বোমা ও গোলা বর্ষণ দ্বারা ইতালীয় আত্মরক্ষার সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি দুর্বল ক'রে মণ্ট্‌গোমারীর সৈন্যদল একেবারে কাটানিয়ার "দুর্গদ্বারে" এসে পৌছল। কাটানিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ঐ অঞ্চলে জার্মাণ সৈন্যেরা প্রবল লড়াই করেছে এবং দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়েছে সত্য কিন্তু অষ্টম বাহিনীর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। প্রকৃত পক্ষে ৮।৯ দিনের মধ্যেই মিত্রবাহিনী সিসিলির প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিকার ক'রে নিল এবং অধিকৃত স্থানে সামরিক গভর্ণমেণ্টও স্থাপন করতে সমর্থ হলো। মিত্রবাহিণীর সহকারী সর্বাধিনায়ক জেনারেল আলেকজাণ্ডার সিসিলিতে মিত্রপক্ষীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। সত্যকথা বলতে কি, এ পর্যন্ত খুব কম রণ-ভূমেই মিত্রবাহিনী এতটা সাফল্য অর্জন করেছে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে পশ্চিম উপকূলে আগরি-গেণ্টো দখলের পর মার্কিণবাহিণী ক্রমশঃ উপরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে একেবারে উত্তর পশ্চিম উপকূল-কোণ দখলের পর মার্কিণ সৈন্যেরা সিসিলির রাজধানী কালেরমো অধিকার করে এবং উত্তর উপকূল ধ'রে ৯।১০টি সহর তারা দখল ক'রে সেণ্টষ্টিফেল পর্যন্ত অগ্রসর হ'তে সমর্থ হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ত্রিভুজাকৃতি সিসিলি দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব কোণ এবং উত্তর পশ্চিম কোণ মিত্রশক্তির অধিকারে। এ থেকে দেখা যায় যে সিসিলির অর্দ্ধেকের বেশী মিত্রপক্ষের করতলগত হয়েছে এবং প্রকাশ যে ৭০ হাজারেরও বেশী নাকি এক্সিস-সৈন্য বন্দী হয়েছে।

এদিকে মুসোলিনীর পদত্যাগের ফলে ইতালীতে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ঝড় ব'য়ে গেল। বদোগ্লিও গভর্ণমেণ্ট আত্মসমর্পন করতে পারেন এই আশায় সামরিক অভিযানের গতি মন্থর ছিল এবং উভয় পক্ষই সিসিলিতে অপেক্ষমান ছিল। অবশেষে বদোগ্লিওর সঙ্গে মিটমাটের প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় জেনারেল আইসেন হওয়ার আবার আক্রমণ আরম্ভ করলেন। জার্মাণরা এ যাবৎ কাটানিয়া অটলভাবে রক্ষা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠলোনা। ৫ই আগষ্ট রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে মিত্রশক্তি কাটানিয়া দখল করে। এখন বাকি রইল শুধু উত্তর পূর্ব কোণ বা মেসিনা সহর ও মেসিনা প্রণালী। কাটানিয়া, মিসট্রেটা ও সেণ্ট্‌ষ্টিফেনের পতনের পর মেসিনা দখলের যুদ্ধও সুরু হয়ে গেল এবং চক্রশক্তির সৈন্যেরাও যেন ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলো।

যাহোক বর্তমানে সিসিলি দ্বীপের উত্তর পূর্বাংশে যে যুদ্ধ আরম্ভ হল তার বিস্তৃত অঞ্চল পূর্ব তীরবর্তী কাটানিয়ার দক্ষিণ থেকে সুরু ক'রে উত্তরবর্তী তীরের সেণ্ট্‌ষ্টিফেন্‌ ও ক্যারোনিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ মাইল পর্যন্ত, বেলপাস, পেটার্ণো সেণ্টরাইশ, রিগেলবাটু, আগিরা, ট্রয়না এবং মিসট্রেটা এই অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত রিগেলবাটু কানাডীয় সৈন্যেরা দখল করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যে আমেরিকান কানাডীয় ও বৃটিশ যে তিনটি প্রধানবাহিণী সিসিলির এই অংশে যুদ্ধে লিপ্ত তারমধ্যে বৃটিশ অষ্টমবাহিণী রয়েছে কাটানিয়ায় বা পূর্ব উপকূলে, কানাডীয় বাহিণী মধ্যস্থলে এবং তার বাঁদিকে বা উত্তরবর্তী অংশে রয়েছে আমেরিকান সপ্তম বাহিণী, যদিও মেসিনা দখলের জন্য মার্কিণ বাহিণীই অগ্রসর হচ্ছে বিশেষ ক'রে তবু এঁদের তিনটি বাহিণীই একসঙ্গে জোর আক্রমণ সুরু করেছে বললে হয়ত ভুল হয় না।

কাটানিয়া ও এটনা আগ্নেয়গিরির পাদদেশে জার্মাণ সৈন্যেরা প্রচণ্ড আত্মরক্ষার সংগ্রাম করেছে। কাটানিয়ার পতনের পর জার্মাণদের আর সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা

সম্ভব নয়, সামরিক দিক থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। বৃটিশ সৈন্যেরা এট্‌নার উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব বা তীরভূমি ধরে দুই বাহু বেষ্টনের মতই অগ্রসর হ'তে থাকে। পূর্বদিকে গিয়ারি এবং উত্তর দিকে বেনডাজো দখলের দ্বারা এটনীর পাদদেশ যেমন বেষ্টিত হয়েছিল তেমনই জার্মাণদের আত্মরক্ষার শেষ প্রাচীরও ভেঙ্গে পড়ল। মার্কিণ সপ্তম বাহিনী ক্রমে কারোনিয়া ও পট্টি প্রভৃতি দখল করে মেসিনা অভিমুখে আরও অনেকখানি অগ্রসর হতে সমর্থ হলো। ক্রমে সিসিলি দ্বীপের সংগ্রাম চরমে উঠলো। ইতালীয় সৈন্যদের যুদ্ধ বহু আগেই শেষ হয়ে গ্যাছে, এখন জার্মাণ সৈন্যেরাও রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতে সুরু করল। মিত্র বাহিনী মেসিনার ২০ মাইলের মধ্যে এসে পৌছল এবং ক্রমে মেসিনা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূ-ভাগই দখল ক'রে নিল। অবশেষে সরকারী খবর পাওয়া গেল যে, আমেরিকান বাহিনী ১৭ই আগষ্ট প্রাতঃকালে মেসিনা দখল করেছে। কিন্তু এতদিন যুদ্ধ করেও মিত্র পক্ষ ২টী জার্মাণ ডিভিসনকে শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারেনি। জার্মাণদের দিক থেকে "Retreat being made every where in order" অর্থাৎ জার্মাণ সৈন্যেরা সর্বত্রই শৃঙ্খলার সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে। সৌভাগ্যক্রমে সিসিলির উত্তর পূর্ব কোণে মেসিনাতে কোণঠাসা হ'য়ে চক্রীসৈন্যেরা টিউনিসের ভুলের আর পুনরাবৃত্তি করেনি। জেনারেল ভন আর্ণিম টিউনিসের যুদ্ধে নিদারুণভাবে কোণঠাসা হয়ে প্রচুর সৈন্যসহ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিলেন—সিসিলির যুদ্ধে তার আর পুনরাবৃত্তি হতে দেয়নি। সামরিক নীতির দিক থেকে জার্মাণদের এই পৃষ্ঠরক্ষার লড়াই একপক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক বলা যেতে পারে। মিত্রশক্তি উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেছিল ছয়মাসের ওপর এবং তার সিসিলি অভিযান শেষ হল প্রায় দেড় মাসে। সময়ের দিক থেকে যদিও একে খুব দ্রুত বলা যায় না; তবুও ভূমধ্যসাগরে মিত্রবাহিনী যে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করেছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। টিউনিসিয়া সিসিলির পথ ক'রে দিয়েছিল—আবার সিসিলি ইতালী জয়ের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। এ যুদ্ধাবসানে মার্কিণ বাহিনী নতুন কি আক্রমণ করে তাই এখন লক্ষণীয় হয়ে রইল।*

* পত্রিকা সাহায্যে

দিলীপকুমারের বই

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ	১৷৹	এদেশে ওদেশে	২৷৹
ভূস্বর্গ চঞ্চল	২৸৹	প্রতিদিনের তীরে (কবিতা)	৷৹
সূর্যমুখী (কবিতা)	২৸৹	অনামি (কবিতা)	২৷৹
আশ্চর্য (উপন্যাস)	১৲	গীতশ্রী (স্বরলিপি)	৩৲
দোলা (উপন্যাস) ১ম খণ্ড	৩৲	২য় খণ্ড	২৲

দিলীপ ও ৺উমা বসুর নূতন রেকর্ড

হোলি খেলব—দিলীপ }
নেকনামি—উমা }
নির্ঝরিণী—উমা
আঁধারের ভোরে গাঁথা—উমা

তুনে ক্যা কিয়া—দিলীপ }
আজ সখি শুন—উমা }
শ্রীচরণে (কীর্ত্তন)—উমা
রূপে বর্ণে ছন্দে—উমা

পুস্তক পরিচয়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ*

দেশে দেশে জ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে চলেছে, জনসাধারণকে বিদ্যা-বিতরণের আয়োজনও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা ভাষায় জনসাধারণের উপযোগী সহজ, সরস, সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বই খুব কম। 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' নামে একটি সুলভ, সারগর্ভ গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি সে সংকল্প কার্যে পরিণত করে' যেতে পারেননি। 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়' আজ তাকে সফল করে' তুলতে উদ্‌যোগী হয়েছেন।

গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ'। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে সাহিত্যের আদর্শসংক্রান্ত কবিগুরুর কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এতে সংকলিত হয়েছে। গদ্যকবিতা বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ করে' রীতি বিচারী আধুনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কোন্ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা এবং অরসিকের হাতে এর কিরকম দুর্গতি হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কুটির শিল্প'। এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ছোট খাটো পণ্যশিল্প প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর অধ্যয়ণ, অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতা রচনাকে সারালো করেছে।

তৃতীয় পুস্তক 'ভারতের সংস্কৃতি' ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা। 'মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা,' 'দাদু' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টির যে পরিচয় দিয়াছেন, এতেও সংক্ষেপে সরস ভাষায় তারই কথা গুছিয়ে বলেছেন। তাঁর অনুভূতি ও রসবোধ দার্শনিক রচনাকে কাব্যের মাধুর্যমণ্ডিত করেছে।

চতুর্থ পুস্তকের বিস্তৃত পরিচয় বাহুল্য মাত্র। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মনপ্রাণ দেশের প্রাণরসে পরিপুষ্ট, জাতির অন্তর্জীবনের সহিত তাঁর পরিচয় অতি ঘনিষ্ট। আমাদের বহির্মুখী নাগরিত জীবনের ফেনোচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করে' তিনি গ্রাম্য চিত্রকলায়, ব্রতকথায়, পূজা পার্বণে, মঠে মন্দিরে জাতীয় ভাবধারার সন্ধান করেছেন। 'বাংলার ব্রত' তাঁর অতি বিখ্যাত বই, অধুনা অপ্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশ করে' বিশ্বভারতী দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

আর, পঞ্চম গ্রন্থ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার।" তড়িৎ বিদ্যা ও উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথা লেখক সংক্ষেপে সরস ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সহজ করে' গুছিয়ে বলার গুণে আলোচ্য বিষয় প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

মাসে মাসে এরূপ সুদৃশ্য, সুলভ ও শিক্ষাপ্রদ এক একখানি গ্রন্থ পড়তে পাওয়া জ্ঞানাভিলাষী সাধারণ পাঠকের পক্ষে বাস্তবিকই লোভনীয় ব্যাপার।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

---

* বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা—(১) সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২] কুটির শিল্প—শ্রীরাজশেখর বসু [৩] ভারতের সংস্কৃতি—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন [৪] বাংলার ব্রত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিমচাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [মূল্য যথাক্রমে ৷৶৹, ৷৶৹, ৷৷৹, ৷৷৹]

দিগন্ত

পূজা-বার্ষিক; প্রথম বর্ষ ১৩৫০। অজিত দত্ত সম্পাদিত। ২০২, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এ-বৎসর যে কয়খানা পূজা-বার্ষিকী হাতে পাইয়াছি তাহার মধ্যে "দিগন্ত" একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছুটি "অটোগ্রাফ" কবিতা লইয়া "দিগন্ত" সুরু হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ প্রায় পনের বৎসর পূর্বে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জন্য যে সব যাত্রাগানের পালা রচনা করিয়াছিলেন তাহার একটি 'মউর ছালের পালা' নানা দিক দিয়া অভিনব।

তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব, প্রতিভা বসু, মণীন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির লেখা ১১টি গল্প ও অচিন্ত্যকুমারের একটি নাটিকা "দিগন্তে" আহরণ করিয়া সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গলার সাহিত্যামোদীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলগুপ্তের 'ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটির মত সুচিন্তিত লেখা বহু দিন পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হইতেছে শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরীর "কল্লোলের দিন" বাঙ্গলার তরুণ সাহিত্য গোষ্ঠীর একটা চমৎকার পরিচয় এই লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অজিত বাবুর মত সুকবি কবিতা সংগ্রহটিও যে ভালই করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। চিত্র সংগ্রহে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের বহুবর্ণে আঁকা একটি ছবি প্রচ্ছদে স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া শিল্পী—রমেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পিদের কয়েকটি "উড্ কাট" 'দিগন্তে' এই দিক-দিয়াও সমৃদ্ধ করিয়াছে।

আমরা "দিগন্ত" সম্পাদককে পূজার এই একান্ত নিরানন্দ বাজারে এই একটি অনাবিল আনন্দ রস-সৃষ্টির জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

[শ্রীশঃ]

প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি

শ্রীউমানাথ সিংহ

পড়লুম কবিতার বইটি—মনে হল যেন একটি গল্প পড়ে উঠলুম তবে কবিতায় নয়, একেবারে পুরোপুরি গল্প ভাব ভাষা রীতি নীতি সবদিক দিয়ে। সাধারণ বাস্তব কথার ছলে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে কাব্যের রসধারা যে কতখানি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকতে পারে সেইটিই দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। প্রেমের যে চির রহস্যের আবরক নরনারীর অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই সঙ্গে বাস্তবের রূপ ও তার সে সমস্তটুকু ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বোধকরি। গল্প ছন্দের কবিতার বই এটি। সাধারণ গল্পের বই হিসেবে মন্দ নয় কিন্তু কবিতার বই হিসেবে বলা যেতে পারে Rhythmহীন গদ্যছন্দের গল্প কথা অর্থাৎ বাস্তবতার সাথে ভাবের খেলা থাকলেও এতে পাইনি কোন সুর, পাইনি কোন ছন্দের দোলা। ছন্দের ভেতর ভাবকে নিয়ে খেলা করতে চাননি কবি—ভাবের বস্তুটিই প্রধান অর্থাৎ ভাবের সাথে বস্তুটির সমন্বয় এখানে তাই বোধকরি শুধু কথা ও বাক্যের ছন্দোবন্ধে তিনি প্রবেশ করতে চাননি। যাহোক্ বাস্তবতার ছবি ফুটে উঠেছে বেশ কয়েক জায়গায় সন্দেহ নেই কিন্তু তা প্রায়ই চলতি ভাষায় কথাচ্ছলে, বারে বারে মনে জেগেছে এ বাস্তবতার রূপ কি এমন করে ফুটিয়ে তোলা যেতোনা যেখানে পেতুম সুর, পেতুম ছন্দ, পেতুম ভাষার গাম্ভীর্য্য ভাবের গভীরতা? অনেকে মনে করেন যে গদ্য কবিতায় থাকবে শুধু ভাবের ছন্দ—সেই ভাবছন্দের মিলন সুরেই ঝঙ্কৃত হবে হৃদয় তন্ত্রী—কথার মিল সেখানে গৌন বস্তু। এদিক দিয়ে বস্তু ও ভাবের ছন্দটাকে রচয়িতা গৌন এক কাহিনী অবলম্বনে গদ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন হয়ত; তবুও বইটি পড়ে তেমন আনন্দ পেলুম না। কতকগুলো জায়গায় কিন্তু মন্দ লাগেনি, যেমন ৯৪ পৃষ্ঠার ধারা ও ভাবটি। তবে অতবড় মহিমাময় কথা ও ভাবের পরই দুপুরে পিকনিকে যাবার হালকা আবহাওয়াটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো; অথচ কবিতার বিষয় বস্তুতে তা না দিলেও নয় বোধকরি। ৪৯ পৃষ্ঠার ভাবধারাটি আরও কয়েক জায়গায় পেয়েছি—যেমন

"এই সৃষ্টি সময়ের নির্জ্জন ক্ষণে
আমি কারো নই—কেউ আমার নয়
আমি একা, আমি—আমি
আমি অহং আমি ওঁ।"

রেবা ঘোষ

চিতাবহ্নিমান

(উপন্যাস) শ্রীকাঞ্চনী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলশ্রী, ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ফাল্গুনীবাবুর এই নূতন উপন্যাসখানি তাঁহার পূর্ব্ব উপন্যাস-গুলির ন্যায় পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছে। লেখকের আদর্শবাদী চিন্তাধারা এবং তাঁহার ভাষার নৈপুণ্য উপন্যাসটিকে যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপন্যাসের নায়ক তপনজ্যোতির চরিত্রে লেখক ভারতীয় আদর্শবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তপনকে অনেকাংশে মধ্যযুগের নায়ক বলা যাইতে পারে। তাহার চরিত্রে কোথাও স্খলন নাই, পতন নাই, ধৈর্য্য অসীম ত্যাগ ও মানসিক বল অসাধারণ এই অসাধারণত্বের সমবায়ে তপন একটী মধ্যযুগের হিরো, নায়কের বিপরীত চরিত্র নায়িকা তপতী নিজে, পাশ্চাত্য প্রভাবের সমন্বয়ে তপতীকে একটি "সোসাইটী গার্ল" ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না, তবুও মনে হয় এই চরিত্রটিই নায়কের চরিত্রের চেয়ে কতকাংশে স্বাভাবিক।

উপন্যাসটীকে একটী নিছক প্রেমের কাহিনী বলা যাইতে পারে কিন্তু এ প্রেম স্বার্থের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়—কামনার উর্দ্ধে। কিন্তু বর্ত্তমান জীবন যাত্রার অসাধারণ জটীলতার সহিত এ প্রেম যেন সম্পূর্ণ খাপ খায় না। ত্যাগ ও ক্ষমার মাঝে যে প্রেমের সম্পূর্ণতা তাহার মাঝেও কামনা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, কারণ উপন্যাসের নায়ক অতিমানুষ নহে, দৈনন্দিন সুখদুঃখের অংশীদার একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, আদর্শের দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেই লেখকের মতের সহিত আমাদের অমিল হইলেও, উপন্যাসটী যে জনপ্রিয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, মানুষের মনের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাত লেখকের বর্ণনাগুণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

পরিশেষে উপন্যাসখানির ত্রুটির শিল্পজাত কাগজের প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। দেশের এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাগজের দুষ্প্রাপ্য সমস্যার দিনে আমাদের দেশীয় কাগজ উপন্যাসখানির অঙ্গসৌষ্ঠবকে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

আমরা উপন্যাসখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আরতি রায়

সৈন্যরা যে চা কী রকম ভালোবাসে তা আজ সবাই জানে। ভারতে অবস্থিত ভারতীয় ও মিত্রবাহিনীর মধ্যে চায়ের চাহিদা এত বেশি যে, এদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ নানা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ভারতের সর্বত্র নতুন নতুন চা-সত্র খোলা হচ্ছে। হায়দরাবাদ থেকে সম্প্রতি খবর এসেছে যে নিজামরাজ্যের ভিতর দিয়ে যে সমস্ত সৈন্য যাতায়াত করে তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সেকেন্দ্রাবাদ, কাজিপেট, রায়চুর ও আওরঙ্গাবাদ এই চারিটি রেল স্টেশনে বিনে-পয়সায় চা, চাপাটি ও সিগারেট দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এটা হচ্ছে সৈনিকদের প্রতি হায়দরাবাদ-বাসীদের প্রীতির একটি নিদর্শন। সংবাদটিতে আরো বলা হয়েছে যে প্রত্যেক দিন এই ক্যান্টিনগুলো থেকে সৈন্যদের ৭৫০ পেয়ালা করে' চা দেওয়া হয়।

কালের যাত্রা

শারদীয়া—

"জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত" বাংলার অনুপম শারদশ্রী কতকাল ধরে' বাঙালীর মনের রসধারা জুগিয়েছে, এবার শরতের দেবী এলেন শ্মশানচারিণী হয়ে। দিকে দিকে বুভুক্ষুর আর্তনাদ, কঙ্কালের স্তূপ. এ কি মর্মান্তিক রূপ? যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে অসংখ্য নরবলি চলেছে অসহায় মানুষের চোখে মৃত্যুকরুণা চাহনি। আদর্শের জন্য যারা আত্মোৎসর্গ করেছে, তাদের দেশবাসী গাইবে জয়গাথা। কিন্তু সর্বস্ববঞ্চিত যে নিরীহ নরনারীর দল আবর্জনা স্তূপে খাদ্যসন্ধান করে' অবোধ পশুর মত প্রাণ হারাচ্ছে, তাদের মৃত্যুর সান্ত্বনা কোথায়?

মৃত্যুতাণ্ডব—

দেশ জুড়ে চলেছে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। ক্ষুধার যে বীভৎস মূর্তি অহরহ চোখে পড়ছে, কিছুদিন পূর্বে তা কল্পনারও অতীত ছিল। কুকুরের মুখ থেকে উচ্ছিষ্ট কেড়ে খাওয়া, মুমূর্ষু শিশুকে ফেলে জননীর পলায়ন, চতুর্দিকে নিরন্নের চীৎকার, এই সোনার ফসলের দেশে এমন দৃশ্য কে কবে ভাবতে পেরেছিল? অন্যায় নয়—অব্যবস্থায়, মাটির বিশ্বাসঘাতকায় নয়—মানুষের হৃদয়হীনতায়, বিকারের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখা দিল প্রত্যক্ষ বাস্তব হ'য়ে। সমাজের ভিত্তিমূল ধ্বসে পড়ছে, এখনও উপরিতলে কারও চোখে তন্দ্রা, কেউ সোনামাণিক কুড়িয়ে সিন্দুক বোঝাই করতে ব্যস্ত, কেউবা কল্পনার আনন্দে ক্রূর হাসি হাসছে, আর দু'একজন পরিণাম চিন্তায় বিমূঢ়। কোথায় প্রতীকার? প্রতিকার কি নেই? "লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ"—এই কি চলবে চিরকাল? আকাশ-বাতাস বিষবাষ্পে পূর্ণ, মহাঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে আসবেনা যুগান্তর?

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ—

বাংলার অন্নাভাবের প্রধান কারণ যে সরকারী অনাচার ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এ কথা কর্তৃপক্ষের আজ বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে। ভারতবাসী বেশী টাকা পেয়ে খাচ্ছে, তাই খাদ্য দুর্লভ হয়ে উঠেছে, এই নব তথ্যের আবিষ্কর্তা ভারত-সচিব এমারি সাহেব সম্প্রতি কমন্স সভায় বলেছেন: "বাংলা দেশের, তথা কলকাতার বর্তমান অবস্থা অশান্তিপূর্ণ, তাতে সন্দেহ নেই। কলকাতায় লোকমৃত্যুর হার গত সাতমাসে শতকরা ত্রিশজন বেড়ে গিয়েছে।" স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এই দুর্গতির কারণ, একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। অন্যায়ও ঘটে, স্বীকারও করতে হয়, কিন্তু গোড়াকার গলদ সংশোধন করবার সুবুদ্ধি কোনকালেই আসেনা, এইটেই দুর্ভাগ্য।

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অনাচার সম্পর্কে সম্প্রতি দু'টি সংবাদ খবরের কাগজে বড় অক্ষরে প্রচারিত হয়েছে। এক, কল-কাতার কোনও রেস্তরাঁয় কৃষি বিভাগীয় জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম-চারীর গ্রেপ্তার। দুই, কতিপয় পুলিস কর্মচারীর বিরুদ্ধে এক গোপন অভিযোগ। রাষ্ট্রযন্ত্রের তৈলনিষিক্ত চক্র বহুক্ষেত্রেই ন্যায়নীতিকে পিষ্ট করে' চলেছে। দেশপ্রেমিকগণের নির্যাতন কল্পে স্বার্থলোভীদের প্রশ্রয়দান যেখানে কর্তৃপক্ষের মূলনীতি, সেখানে দেশের এই অবস্থাই স্বাভাবিক। আজ হয়তো দু'চার-জন কর্মচারীর শাস্তি হতে পারে। কিন্তু তাতেই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় যাঁরা দেশকে বাঁচাতে চাইবেন, তাঁরা কোথায়? তাঁদের সহযোগিতা ঘৃণা ভরে উপেক্ষিত। যারা নির্বিচারে প্রভুর মনস্তুষ্টি করতে প্রস্তুত তারাই অনুগৃহীত। কিন্তু টাকা বা খেতাবের লোভ দেখিয়ে যাদের দিয়ে কাজ হাসিল করানো যায়, তাদের 'ধর্মপুত্র' হবার সম্ভাবনা কোনকালেই নেই।

চাউলের বাজার—

বাংলা সরকার চাউলের দর বেঁধে দিয়েছেন: পাইকারী বিক্রীর পক্ষে ২৮শে অগষ্ট থেকে প্রতি মণ ৩০৲, ১০ই সেপ্টে-ম্বর থেকে প্রতি মণ ২৪৲ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিমণ

২০৲। খুচরো বিক্রীর পক্ষে দু'টাকা ক'রে বেশী। কিন্তু ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং কার্য্যতঃ সরকারনীতি ব্যর্থ হয়েছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন ও সরকার পক্ষের উত্তর দাবী করেন। মিঃ সুরাবর্দির অনুপস্থিতিতে প্রথম দিন বিবৃতি দেন স্যর নাজিমুদ্দীন। পরদিন মিঃ সুরাবর্দি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেন। আর আলোচনার সুযোগ না দিয়ে সরকারপক্ষ বাজেট পাস করাবার চেষ্টা করায় বিরোধীদল প্রতিবাদ জানিয়ে তৎক্ষাৎ পরিষৎকক্ষ পরিত্যাগ করেন।

অনাচারের তদন্ত—

বাংলার খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগের ফলে ভারত সরকার নাকি স্যর মরিস্ গায়ারের অধীনে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করার কথা ভাবছেন।

কমিটির উপযোগিতা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু দুর্নীতির মূল কারণ উচ্ছেদ না করলে শুধু তদন্তে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। স্বার্থের রাজত্বে কর্তব্যবোধ উৎসাহ পায়না, লোভই হয় মন্ত্রী। বিবেকের প্রভুত্বই সদাচারের পরিপোষক।

লাটবদল—

স্যর জন হার্বার্ট অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় স্যর রাদারফোর্ড বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেছেন। আশা করি, স্যর হার্বার্টের আমলে বাংলাদেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, নূতন গভর্ণর তার সংশোধনে মনোযোগী হবেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একখানি চিঠিতে খোলাখুলি ভাবে পূর্বতন লাট সাহেবের এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন।

সরকারী ব্যবসাদারি—

সম্প্রতি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবসাদারি সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করেছেন। পাঞ্জাব থেকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গম কিনেছেন মণ প্রতি ৯॥০ থেকে ১০।০ দরে। সেই গম নিয়ে বাংলা গভর্ণমেণ্ট ব্যবসাদার[illegible] দিচ্ছিলেন ১৫॥০ দরে, আর সরকার নিয়ন্ত্রিত দোকানে [illegible] বিক্রি হচ্ছিল আট আনা সের অর্থাৎ কুড়ি টাকা মণ দ[illegible] বাইরে সাধারণ বাজারদর ছিল আরও বেশী। এই দুর্ভি[illegible] দিনে সাড়ে ন'টাকার জিনিষ কুড়ি টাকা দরে বিক্রী ক[illegible] বাংলা সরকার হিসেব দেখিয়েছেন, আমদানিকালে বহু [illegible] নষ্ট হয়, ষ্টেশনে জিনিষ পড়ে' থাকলে ক্ষতিপূরণ দিতে [illegible] আরও অনেক ঝড়তি পড়তি আছে, অতএব ওর [illegible] খরচা পোষায় না। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের অভিযোগের [illegible] বাংলা সরকার ঘোষণা করেছেন, আটার দর খুচরো ছ'আ[illegible] সের হবে। জানি না, এখন কি করে' খরচা পোষাবে।

আর্ত্তত্রাণ—

দুঃস্থ নরনারীর সাহায্যের জন্য দেশের অনেক স্থানে সে[illegible] সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও বিনামূল্যে, কোথাও [illegible] মূল্যে গরীব লোকদের খাওয়ানো, কোথাও বা কমদরে খাদ্যদ্র[illegible] বিক্রয় করা হচ্ছে। দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মেটাতে [illegible] পারলেও যাঁরা এই মহৎকার্য্যে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা [illegible] বাদের পাত্র। পাঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও ভারতে[illegible] অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা বাংলার দুঃখমোচনে যে আ[illegible] প্রকাশ করছেন, তা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। রাজনীতির ঘূর্ণি[illegible] আবর্তে হয়তো সময়ে সময়ে প্রাদেশিকতা উগ্র হয়ে ও[illegible] কিন্তু ভারতবর্ষে যে সুগভীর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ, দুঃখের দি[illegible] তা সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করতে পারি। এই ঐক্যবোধ [illegible] যুক্ত হোক্, ভারতের সুসন্তানরূপে আমরা যেন মাথা উ[illegible] দাঁড়াতে পারি।

মিঃ পোলার্ডের মামলা—

মিঃ পোলার্ড ছিলেন বহরমপুরের পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডে[illegible] স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মজুমদার একটি জামি[illegible] দরখাস্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে অপ[illegible] করেছেন, এই অভিযোগে, বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] পোলার্ডের দুশো টাকা জরিমানা করেন। উক্ত দণ্ডাদে[illegible] বিরুদ্ধে মিঃ পোলার্ডের আপীল নদীয়ার সেশন কোর্টে ডিস[illegible] হয়ে যায়। অতঃপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এই বলে' আবেদন করেন যে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেব তাঁর বিচারে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করছিলেন। প্রধান বিচারপতি, মিঃ লজ্ ও মিঃ খন্দকার—তিন জনকে নিয়ে 'স্পেশাল বেঞ্চ' বসে। মিঃ পোলার্ডের জরিমানা মকুব হয়ে যায়। এই মামলায় প্রধান বিচাপতি যে রায় দিয়েছেন তাতে ফজলুল হক সাহেবের সমালোচনাই পৌনে যোলো আনা। সাধারণ পাঠকের খটকা লাগতে পারে, বিচারটা মিঃ পোলার্ডের হয়েছে, না হক-সাহেবের। অথচ হকসাহেবের উল্লিখিত চিঠি-পত্রে "অন্যায় হস্তক্ষেপের" কোনও নিদর্শন দেখা যায় না। বরঞ্চ বিচারে মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, এই আকাঙ্ক্ষাই চোখে পড়ে। তবে, 'বড়' দের দৃষ্টিশক্তিও 'বড়', যুক্তি অযুক্তি সবই-তো তাঁদের হাতের পুতুল।

বাংলা গভর্ণমেণ্টের আপীল—

কেন্দ্রীয় আদালত ১৪নং অর্ডিনান্সের ৩নং উপধারা বৈধ বলে' ঘোষণা করছেন। তাঁরা বাংলা গভর্ণমেণ্টের অর্ডিনান্স-সম্পর্কিত ৮টি আপীলই অগ্রাহ্য করছেন এবং এঁদের ২৬ ধারা অনুসারে আটক রাখার নীতির নিন্দা করছেন।

বাংলা সরকারের বাজেট—

নূতন মন্ত্রিদলের বাজেটে সাতকোটি ছত্রিশলক্ষ টাকা ঘাটতির আশ্বাস পাওয়া গেছে। মা ভৈঃ। দুঃখদুর্দশা ঘুচলো বলে'। সকল সমস্যার সমাধান এঁদের হাতের মুঠোয়। যাদু-কর এঁরা! হাত ঘোরান, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে টাকা ঝক-ঝক করে ওঠে, দর্শকেরা এগিয়ে যায় আর সে টাকা অদৃশ্য হয়। এখনও তো ভাবী সৌভাগ্যের চিত্র এঁরা ভাল করে' আঁকেন নি। মরা মানুষের হাড়ে জমি সারালো হয় না? তাহলেই সামনের বছর কৃষির উন্নতি অনিবার্য্য, "বেশি করে' ফসল ফলাও" নীতি সার্থক হবে। কে ফলাবে? না, না, ও প্রশ্ন অবান্তর। জমি আঁকড়ে যারা মরতে পারে, তারা ফসল ফলাতে পারবে না?

দামোদর—

দামোদরের বন্যা একাধিকবার বাংলাদেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার প্রকোপকে প্রশমিত করবার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। ডক্টর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা ১৫ই অগষ্ট তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১৯১৩ এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বন্যার পরে এ দিকে একবার বাংলা গভর্ণ-মেণ্টের দৃষ্টি পড়েছিল। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যথারীতি অনু-সন্ধানাদি করানো হয়। বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক ব্যয় অনুমান করা হয় দু'কোটি টাকা। কাজ আরম্ভের উদ্‌যোগ হতেই বড়বড় কয়েকজন কয়লা-খনির মালিক আপত্তি করে' বসেন' দামোদরের বাঁধ দিলে মাটির ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে এসে খনির ক্ষতি করবে। সেচ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ এ আশঙ্কা অমূলক মনে করেন। কিন্তু জরীপ বিভাগের বড়কর্তা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেন, যে আশঙ্কা সত্য হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নয়। সমস্ত কাজ ঐখানেই থেমে যায়। আট বছরের অনুসন্ধান ও উদ্‌যোগ অমনি করে' নিষ্ফল হয়ে গেল। তখন বাঁধ দিলে আজ নদীর ধ্বংস-শক্তি এতটা বাড়ত না, সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের কতকটা শ্রীবৃদ্ধিও ঘটত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেড়কোটি টাকা খরচ করে' অ্যাণ্ডার-সন খাল কাটা হয়েছে, অথচ তাতে চাষীর বা জনসাধারণের কিছু উপকার হয় নি। দামোদর-উপলক্ষে ব্যয় অনেক হয়েছে কিন্তু সমস্যার সমাধান একবিন্দুও হয় নি। অথচ এর গুরুত্ব যথেষ্ট। এর তীরবর্তী কৃষি-অঞ্চলের কথা বাদ দিলেও, এরই কূলে বাংলার প্রধান প্রধান কয়লাখনি, এবং ছোটনাগপুরের সঙ্গে বাংলার রেলপথের যোগসূত্র। সরকারী শৈথিল্য এবং অব্যবস্থা দেশের পক্ষে দিনের পর দিন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। প্রতীকারের উপায় অবিলম্বে স্থির করা উচিত। ২২শে অগষ্টের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" আর একজন লেখক ডক্টর সাহার বাঁধ দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে' বলেছেন, কতকগুলি স্থানে বন-রক্ষা বন্যাবেগকে শান্ত রাখবার অন্যতম উপায়। প্রতী-কারের পন্থা স্থির করে' অবিলম্বে কাজে হাত দেওয়া দরকার। অফিসী কায়দাকানুনের চেয়ে মানুষ বাঁচানোর প্রয়োজন অনেক

বড়, একথা মনে রাখলে গভর্ণমেণ্টের কুঁড়েমি কমতে পারে।

ইটালির আত্মসমর্পণ—

৯ই সেপ্টেম্বরের কাগজে প্রকাশ ইটালির সেনাদল মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মার্শাল বাদোল্লিও এই উপলক্ষে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। দক্ষিণ ইটালি মিত্রপক্ষের প্রভাবাধীন হ'লেও উত্তর ও মধ্যইটালি এখন পর্যন্ত জার্মেনির ছায়াতলে। মুসোলিনি বন্দী হয়েছেন বলে' সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু পরে "হিটলার তাঁকে উদ্ধার করে' নিয়ে গেছেন। রেডিও-বক্তৃতায় তিনি রাজার উপর দোষারোপ করছেন এবং ইটালীয়গণকে আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করেছেন। ইটালির রাজা ভিক্টরের সিংহাসনত্যাগ ও পলায়ন সম্বন্ধে নানারকম গুজব রটেছে, এখন পর্যন্ত সত্যাসত্য নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে তৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।